না ফুটিয়া যখন অন্তস্তল দেশে সিন্ধুবারির মত গুর্ গুর্ করিয়া বহিয়া যাইত, তখন সুরমা আসিয়া আমার সকল কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত। আমি বলিতে না চাহিলে সে সকল কথা খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া জোর করিয়া আমার নিকট হইতে বাহির করিয়া লইত। সকল কথা বাহির করিয়া লইয়া কত সান্ত্বনার কথা বলিত। তখন বয়সটা খুবই অল্প ছিল, সংসারের রহস্য যে তখন কিছুই বুঝিতাম না, কাজেই প্রতিপদে কত ভুলই না করিয়া বসিতাম।

খুকীটি আমার যেদিন পুড়িয়া গিয়াছিল, তা'র পর দিন সকালে উঠিয়া শুনিলাম, সুরমা শ্বশুর বাড়ী হইতে পিত্রালয়ে আসিয়াছে। তাহার পিত্রালয় ছিল আমাদেরই বাড়ীর পার্শ্বে। আমি পিশিমার নিকট অনুমতি লইয়া সংবাদ শুনিবা মাত্র সুরমাকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া গেলাম।

অনেক সুখ দুঃখের কথার পর সুরমা বলিল, "আমার ছেলেটি ভাই কিছুতেই সারিতেছে না, পেট জোড়া প্লীহা, লিভারটাও বড় হইয়াছে। জ্বর রোজ হয়না বটে কিন্তু এমন মাস নাই, যে মাসে দু'বার তিন বার করিয়া না হয়। কত চেষ্টা করা হইল, কিন্তু তাহাকে ভাল করিতে না পারিয়া মনের সুখ কিছুতেই পাইতেছিনা ভাই।

আমি বলিলাম—"ডাক্তার বদ্দিরা কেউ কিছু করিতে পা'রলনা।"

সুরমা বলিল—বদ্দি দেখাই নাই, কারণ বদ্দি-চিকিৎসার উপর ওঁদের বড় ভক্তি নাই, একবার নাকি কোন্ একটা বদ্দি আসিয়া ওঁর কি একটা অসুখে আস্ত একটা ভুল করিয়া বসিয়াছিল, সেই থেকে উনি বদ্দি চিকিৎসার উপর বড় চটা। ডাক্তার অনেক দেখান হইয়াছে কিন্তু তা'রা কেবল গাদা গাদা কুইনাইন দেয়, তা'খেয়ে জ্বর বন্দ হয় বটে কিন্তু একবারে যায় না।

আমি বলিলাম,—তা' তোমার স্বামী তো ভাই বদ্দি চিকিৎসার উপর একেবারেই চটা। আমি কিন্তু তা'র চেয়েও একটা অন্যায় কাজ ক'রতে বলি, তা' তুমি ক'রবে কি!

সুরমা বলিল—কি!

আমি বলিলাম আমার পিসীমা, ডাক্তার বদ্দি না হ'লেও চিকিৎসার অনেক বিষয় জানেন। আমি বলি কি,—দিন কতক তাঁর উপর নির্ভর ক'রলে মন্দ হ'তনা।

সুরমা সম্মতি প্রকাশ করিল। বলিল, তা' ক্ষতি কি, তিনি তো এখানে নাই, ভাল দেখাই যা'কনা,—যদি পিসীমা সারাইতে পারেন, তখন তাঁকে সব্ কথা ব'লব, নইলে কিছুই ব'লবার দরকার নাই।

এই পরামর্শের পর আমরা দুইজনে পিসীমার নিকট আগমন করিলাম, সুরমার ছেলেটীও অবশ্য আমাদের সঙ্গে আসিল।

আসিয়াই আমি পিসীমাকে পাইয়া বসিলাম। বলিলাম,—পিসীমা আমাকে সেবার শিক্ষা করিবে বলিয়াছিলে, শুধু মুখের উপদেশে শিক্ষা দিলে চলিবেনা, চিকিৎসার ধরণ দেখাইয়া শিষ্যা করিতে হইবে।

এই বলিয়া সুরমার ছেলেটির অসুখের কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলাম।

পিসীমা সুরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—খোকার বয়স কত হইয়াছে।

সুরমা বলিল—এই যেটের কোলে তিন বছরে প'ড়েছে।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মাইথায়। সুরমা বলিল—থায় বইকি? মাই না দিলে কচি ছেলে থাক্‌বে কি ক'রে?

পিসীমা বলিলেন—ওইটা আগে বন্দ কর্‌তে হ'বে। যে সব ডাক্তারদের দেখাইয়াছিলে তাঁরা কি মাই বন্দ ক'র্‌তে বলেনি!

সুরমা বলিল,—কেউ কেউ বলেছিল, কিন্তু খোকা মাই না পেলে যে অস্থির হ'য়ে উঠে. পিসীমা। কাজেই মাই বন্দ ক'র্‌তে পারিনি।

পিসীমা বলিলেন,—যদি সহজে বন্দ ক'র্‌তে না পার, তা'হ'লে মাইতে তেতো জিনিস মিশিয়ে দিতে হবে। নিমপাতা বেটে, ভাঁটপাতা বেটে কি বেনের দোকানে যে চিরাতা পাওয়া যায়, তাই বেটে, কি কালমেঘের পাতা বেটে মাইতে লাগা'তে হয়, ওরই কোন একটা জিনিষ লাগা'লে মাইয়ের দুধের মিষ্টিভাব তোতো হ'য়ে যায়, তখন আর মাই খেতে চা'বেনা। এমনই ক'রে মাই বন্দ ক'র্‌তে হ'বে। মাই বন্দ না ক'র্‌লে হাজার ডাক্তার বদ্দি দেখা'লেও এ রোগ কিছুতেই সার্‌বেনা।

সুরমা বলিল,—আচ্ছা আমি ঐরূপ ক'রে বন্দ ক'রব পিসীমা। এখন তার পর কি ক'রব—তা'বল।

পিসীমা বলিলেন,—আগে নিয়ম, তা'র পর ওষুধ। অনেক সময় ওষুধ না খাইয়েও শুধু নিয়মে রেখে অনেককে ভাল করা যায়। যা'হোক নিয়মগুলার কথা আগে বলি শোন। দুধ যা' দেবে, তাতে প্রত্যেকবারেই একটু পিঁপুলের গুঁড়া মিশিয়ে দেবে আর দুধ গরম ক'রবার সময় অর্দ্ধেক দুধ আর অর্দ্ধেক জল দিয়ে আর তা'তে একখানা আস্ত পিঁপুল ফেলে দিয়ে সিদ্ধ ক'রে নেবে। খাঁটি ঘন দুধ এ রোগে মোটেই ভাল নয়।

সুর। খাঁটি দুধ ভাল নয় কেন পিসীমা?

পিসী। খাঁটি দুধ ভাল নয় এইজন্য যে খাঁটি দুধ হজম ক'রতে যে শক্তি দরকার, পীলে নীবার বড় হ'লে সে শক্তি ক'মে যায়। পীলেয় দুধ দেওয়া চলে কিন্তু নীবারে দুধের মাত্রাটা যত কম দেওয়া যায় ততই ভাল।

সুর। তা' পিসীমা আমি দুধ না হয় কমই দেবো কিন্তু দুধ কম দিলে আরও তো কিছু খেতে দিতে হ'বে। তা' আর কি খেতে দেবো—তা'রও দু'একটা ব্যবস্থা ব'লে দাও।

পিসী। দেখ,—শঠীর পালো ব'লে আজকাল এক রকম খাবার বাজারে পাওয়া যায়। সেই শঠীর পালো দিয়ে দুধ সিদ্ধ ক'রে দিতে পর্‌লে এ রোগে খুব উপকার পাওয়া যায়।

সুর। শঠীর পালো পিসীমা ডাক্তারেরাও ব্যবস্থা ক'রেছিল। এখনো মাঝে মাঝে দিয়ে থাকি।

পিসী। মাঝে মাঝে নয়, ওটা রোজই দিও;—শঠী নীবারের একটা মস্ত ওষুধ। তা'ছাড়া দু'টি দু'টি পোরের ভাত দিতে পার্‌লে ভাল হয়।

সুর। তা' আর পা'রবনা কেন পিসীমা, তা' খুবই পারবো। তবে ভাত খাওয়ান এখনো অভ্যাস ক'রেনি—এই যা' কথা।

পিসী। ভাত খাওয়ান অভ্যাস ক'র্‌তে হ'বে। ভাত খাওয়ান এ রোগে খুব উপকারী। তবে সে ভাতটা পোরে'র

হওয়া চাই। আর তা'র সঙ্গে কাঁচা পেঁপে, মানকচু, ওল—এসব কিছু কিছু সিদ্ধ ক'রে খুব টিপে একটু আধ্‌টু খাইয়ে দেওয়া ভাল। পেঁপে, মানকচু আর ওল—এ তিনটি জিনিস আহার, ওষুধ—দুইই জান্‌বে। পাকা পেঁপেও একটু একটু দিতে পার। তাতেও বেশ উপকার হ'বে।

সুর। জল খাবারের সময় দু'টি কিস্‌মিস্‌, খেজুর, মিছরি এ সব দিতে পারি কি!

পিসী। খুব পার। ও গুলিও ও রোগের আহার ওষুধ। তবে মিছরিটা খুব বেশী দিওনা—মিছরি বা কোন মিষ্টি বেশী খেলে ক্রিমির সৃষ্টি হয় আর ছেলে বয়সে বেশী মিষ্টি অভ্যাস ক'র্‌লে তোত্‌লা হ'য়ে পড়ে।

সুর। পিসীমা, আমরা যেখানে থাকি, সেখানে আনারসটা খুব বেশী পাওয়া যায়, এইজন্য আমরা আনারসটা খেতে একটু বেশী ভালবাসি। খোকাকে কি সে আনারসের দু'এক টুক্‌রা দিতে পারি?

পিসী। জ্বর ভাল হলে আর খুব মিষ্টি আনারস হলে পার। আনারসে নীবারের ক্রিয়া ভাল হয় ক্রিমি থাক্‌লেও আনারস খেলে উহা নষ্ট হ'য়ে যায়। পীলে আর নীবার—এ দু'টী রোগে যাতে রোজ দাস্ত পরিষ্কার হয় এমন ব্যবস্থা করা দরকার। আনারসে কোন কোন ক্ষেত্রে সেটা সহজেই হ'য়ে থাকে ব'লে আনারস পীলে নীবারে উপকারী।

সুর। থাক্‌—তা'র পর এখন ওষুধের কথা বল।

পিসী। হাঁ এইবার তাই ব'ল্‌ব। কালমেঘের গাছ দেখেছিস্‌তো? সেই কালমেঘের ১০।১২টা পাতা আর আড়াইটে গোলমরিচ একসঙ্গে বেটে ৪টে ক'রে বড়ি ক'র্‌বি—তাই সকাল বেলা একটা, দু'পর বেলা একটা আর সন্ধ্যাবেলা ১টা দুধের সঙ্গে কি জলের সঙ্গে গুলে খাইয়ে দিবি। এই শুধু কালমেঘই জান্‌বি নীবারের মহা ওষুধ। এই কালমেঘের আরক তৈরি ক'রে এখন নাকি অনেক ডাক্তারেও বিক্রি ক'র্‌ছে। তা' তার চেয়ে কিন্তু টাট্‌কা কালমেঘ তুলেনিয়ে বড়ি তৈরি ক'রে নেওয়া কি কালমেঘের রস খাওয়ান অনেক ভাল। এতে উপকার বেশী পাওয়া যায়।

সুর। মাঝে মাঝে যে জ্বর হয়, তা'র জন্য কি ক'রব?

পিসী। এতে জ্বরও যা'বে। তা' ছাড়া আর একটা কাজ ক'র্‌তে পারিস্‌। শিউলিপাতা, ক্ষেৎপাপড়া আর গাঁট বাদ দিয়ে গুলঞ্চলতা—এক একটা জিনিস ॥৶০ আনা ওজনে নিয়ে বেশ ক'রে থেঁতো ক'রে কলার পাতায় জড়িয়ে একখানা তাওয়া বা চাটুর ওপর আগুণের জ্বালে গরম ক'রে নিয়ে সমস্ত রাত্রি শিশিরে রেখে দেবে। তা'র পর সকাল বেলা কলার পাতাটা খুলে ফেলে নেকড়ার পুঁটুলি ক'রে রসটা নিঙ্‌ড়ে নেবে। এই রকম ভাবে যতটা রস হ'বে, তা'র অর্দ্ধেকটা ফেলে দেবে, বাকী অর্দ্ধেকটা খুব ভোরবেলা ঝিনুকে নিয়ে খাইয়ে দেবে। দিন কতক এই রকম ব্যবস্থা ক'রলেই জ্বর বন্ধ হ'য়ে যা'বে। এটাকে চল্‌তি কথায় 'ঘুসড়ো' ব'লে থাকে।

সুর। যে ক'টা জিনিসের নাম ক'র্‌লে ওর সব গুলিই যে বড় তেতো পিসীমা, অত তেতো জিনিস কচি ছেলে খা'বে কি ক'রে?

পিসী। একটুখানি মধু মিশিয়ে দিও. তা'হ'লে তেতোটা কিছু কম লাগ্‌বে। আর একটা কাজ ক'র্‌তে হবে,—রোজ একটু একটু চোণা খাওয়াতে হ'বে, তা' সে চোণা আবার যে সে গরুর হ'লে হ'বে না. কৈলে বাছুরের হওয়া চাই।

সুর। কৈলে বাছুরের ভাবনা নাই, কৈলে বাছুর আমাদের বাড়ীতেই আছে কিন্তু চোণা যে খেতে বড্ড খারাপ, খা'বে কি রকম ক'রে?

পিসী। ঝিনুকে নিয়ে ঢক্ ক'রে গিলিয়ে খাইয়ে দিবি,—আর খা'বে কেমন ক'রে? আর শুধু খাওয়ান নয়, একটা ভাঁড়ে ক'রে খানিকটা চোণা গরম ক'রে সেই ভাঁড়টা পীলে আর নীবারের উপর দু'বেলা সেঁক ও দিতে হ'বে।

সুর। সে কি পিসীমা, কচিছেলে, গরম তাত্ সইতে পা'র্‌বে কেমন ক'রে?

পিসী। খুব পা'র্‌বে, যা'তে সয়, তাই ক'রে দিতে হ'বে। চোণার সেঁকতো নয়, আমরা ওকে সেঁক বলি কিন্তু বদ্দিরা ওকে স্বেদ বলে। চোণার স্বেদের মত উপকারী পীলে নীবারে আর অন্য জিনিস নাই।

সুর। ওষুদপত্তরের আর কি ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'বে?

পিসী। তোর ছেলের জন্য আর কিছু ব্যবস্থা ক'র্‌তে হ'বেনা, যে সব ব্যবস্থা ব'লে দিলাম, শুধু এই সব ক'র্‌লেই তোর ছেলে বেশ সেরে উঠ্‌বে। লোকনাথ বদ্দি ব'ল্‌ত শাস্তরে কচিছেলেদের জন্য নাকি বেশী ওষুদ দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। কচি ছেলেদের যত অল্প ওষুদ খাইয়ে রোগ সারাতে পারা যায় তা'রই চেষ্টা করা উচিত।

সুর। তবু পিসীমা আরও গোটাকতক মুষ্টিযোগ ব'লে দাওনা, যদি এতে না সারে, তা'হ'লে সেই সকল ব্যবস্থা ক'রব।

পিসী। আচ্ছা তোর ছেলের জন্য যা বল্লুম আগে তা করে দেখ্—পরে ছেলে আরাম হলে যদি বদ্দিগিরি করবার জন্যে আরও কিছু জানিবার ইচ্ছা হয় তখন বল্‌বো।

সুরমা বলিল—আচ্ছা পিসীমা, তুমি আমার ছেলের জন্য যে সকল ব্যবস্থার কথা ব'লেছ, আমি সেই সকলই পালন কর'ব। এই বলিয়া সুরমা পিসীমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

কিছুদিন পরে শুনা গেল, সুরমার ছেলেটি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিয়াছে। আমার পিসীমার উপর আরও ভক্তি বাড়িয়া উঠিল। আমার অপেক্ষা আরও বাড়িল সুরমার স্বামীর। তিনি শ্বশুরালয়ে আসিয়া সমস্ত কথা অবগত হইলেন এবং সেই সময় হইতে স্থির করিলেন, যে কোন রোগই হউক না কেন, বৈদ্যচিকিৎসা ভিন্ন আর কিছুই করাইবেন না।

সাল্‌সার মস্‌লা।

দেশে আজকাল সাল্‌সার ছড়াছড়ি। যত-গুলি কবিরাজ—তত সংখ্যক "সাল্‌সা"তো আছেই তাহা ছাড়া—মুদী, পশারী, দোকানী, কোম্পানী, অনেকেই সাল্‌সার আবিষ্কারক। সাধুভাষায় সাল্‌সার এত নাম রচিত হইয়াছে যে. সে নামের "নামাবলী" গায়ে দিয়া বঙ্গ জননী কিছু ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। সাল্‌সার বিজ্ঞাপনেরই বা চটক কত! সকলেই বলিতেছেন—"আমার সাল্‌সাই আদি ও অকৃত্রিম, এমন সাল্‌সা এ পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যধামে আর আবির্ভূত হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না।" সাল্‌সার গুণ শুনিয়া খরিদ্দার কোন্‌টা ছাড়িয়া কোন্‌টা কিনিবে,—তাহা স্থির করিতে পারে না। ফলশ্রুতির লিখন-ভঙ্গী এমন চমৎকার—যে, তুমি রোগী হও, নিরোগী হও, ভোগী হও, যোগী হও—কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নাই, তোমাকে সাল্‌সা কিনিতেই হইবে। বাল্‌সা হইতে বাঘী পর্য্যন্ত সকল রোগেই সাল্‌সার ব্যবহার। সাল্‌সার কাট্‌তি—বৈষ্ণবের মাল্‌সা ভোগকেও ছাড়াইয়া উঠিয়াছে।

আমিও আজ সাল্‌সা লইয়া পাঠকগণের সম্মুখে হাজির হইলাম। তবে আমার সাল্‌সা আমার আবিষ্কৃত নহে। আমার পিতামহ—এই সাল্‌সার ফর্দ্দখানি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি,—আমার পিতার আমলেও দেখিয়াছি—এই সাল্‌সা সেবন করিয়া অনেকে উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। আমিও অনেককে এই সাল্‌সা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

সাধারণের উপকারের জন্য—নিম্নে সাল্‌সার ফর্দ্দখানি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মস্‌লা।	ওজন।	গুণ।
অনন্তমূল	॥০ আধভরি	শোণিত শোধক
সাল্‌সা রুট্	।০ চারি আনা,	শোণিত শোধক
জাঙ্গী হরিতকী	৵০ আনা,	সারক,
বড় হরিতকী	৵০ „	„
যষ্টিমধু	৵০ „	বলকারক,
তোপচিনী	৵০ „	পারার দোষ নাশক, বাত নাশক,
সাচি ফরাস্	৵০ „	পিত্ত নাশক,
মিএন্	৵০ „	কফ নাশক,
ইশব্‌গুল	৴০ „	ঠাণ্ডা ও বায়ুনাশক,
অশ্বগন্ধা	৵০ „	বলকারক রসায়ন,
গোয়াকম্	৵০ „	বেদনা নাশক,
আরবী গঁদ	৴০ „	মেহ নাশক,
মৌরী	৴০ „	ঠাণ্ডা, তৃষ্ণা নাশক,
পদ্মকাষ্ঠ	৩ রতি,	জ্বর ও দাহনাশক,
ছোট এলাচ	৩ „	গরম, কফ নাশক,
বড় এলাচ	৩ „	ঠাণ্ডা পিত্ত নাশক,
সফেদ্ মুষলী	৴০ „	শুক্রবর্দ্ধক,
জৈত্রী	৩ রতি,	গরম, উত্তেজক,
তেজবল	৴০ „	উত্তেজক,
তিপুর	৵০ „	পাচক,
কাবাব চিনী	২ রতি,	স্বপ্নদোষ ও মেহনাশক।
তোক্‌মারী	৩ রতি,	শুক্র কারক,

বিহীদানা	৩ রতি,	মূত্রকারক,
সালম্ বিছরী	/০ ,,	বলকারক,
শ্বেত চন্দন	/০ ,,	মেহ নাশক,
রক্ত চন্দন	/০ ,,	পিত্ত নাশক,
তেজপাত	২ রতি,	কফ নাশক,
জাফ্রাণ	১ রতি,	উত্তেজক,
দারুচিনী	৩ রতি,	উত্তেজক, কফনাশক,
জোলাফা	৩ ,,	সারক,
তোক বলাম্বু	৩ ,,	ক্ষত নাশক,
কাল্পিন্-ফুল	৩ ,,	মেদোবর্দ্ধক,
রেউচিনি	/০ ,,	সারক,
লবঙ্গ	/০ ,,	কফনাশক, পাচক,
যোয়ান	৩ রতি,	পাচক,
গোক্ষুর বীজ	৩ ,,	মূত্র কারক
বংশলোচন	৩ ,,	হৃদ্‌পিণ্ডের বল বর্দ্ধক,
গোলাপ ফুল	/০ আনা,	ঠাণ্ডা, সারক,
সোণামুখী	৩ রতি,	সারক,
কালাদানা	৩ রতি,	ঐ
ধনে	/০ আনা,	পিত্তনাশক,
পিপুল	/০ ,,	অগ্নি বর্দ্ধক।

মস্‌লাগুলি বেশ করিয়া ঝাড়িয়া হামামদিস্তায় কুটিয়া, মাটীর হাঁড়িতে কাঠের জ্বালে, তিন সের জলে সিদ্ধ করিতে হয়। তিন পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ছাঁকিয়া বোতলে পূরিয়া রাখিতে হইবে। এক ছটাক মাত্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে সেবন করিতে হইবে। এই সাল্‌সা, পুরাতন মেহ, রক্তদুষ্টি উপদংশ, বাত, ঘুষ্‌ঘুষে জ্বর, পুরাতন সর্দ্দি, কোষ্ঠবদ্ধতা, অনিদ্রা, দৌর্ব্বল্য; রক্তহীনতা, পুরুষত্ব হানি, অগ্নিমান্দ্য, প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহা ৪২ দিন খাইতে হয়। এই সালসার উপকরণগুলি কতক কবিরাজী কতক হাকিমী। আমি যতগুলি রোগীকে এ সালসা খাওয়াইয়াছি—সকলেই ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই সালসা সেবনে—দাস্ত, মূত্র ও ঘর্ম্ম হইয়া এক সপ্তাহেই শরীর গ্লানি-শূন্য হইবে। দ্বিতীয় সপ্তাহে—ক্ষুধা বাড়িবে, তৃতীয় সপ্তাহে—দূষিত রক্ত পরিষ্কৃত হইবে, চতুর্থ সপ্তাহে নূতন রক্ত-কণিকা জন্মিবে। পঞ্চম সপ্তাহে ব্যাধি নষ্ট হইবে। ষষ্ঠ সপ্তাহে শরীরের বল বৃদ্ধি হইবে।

সালসা সেবন কালীন—শাক- অম্ল, পিষ্টকাদি গুরুপাক দ্রব্য, ডিম্ব, মাংস, গুড়, দধি, পাকাকলা তৈলের তরকারী এবং কলায়ের দাল খাইতে পাইবে না। কাঁচা-পাকা জলে স্নান করিবে। রাত্রি জাগরণ, দিবা নিদ্রা ও স্ত্রী-সঙ্গ—পরিত্যাগ করিবে।

মুন্সী শ্রীআস্‌রাফ আলি হাকিম।

চূড়ান্ত-সস্তার চ্যবন প্রাশ।

—:o:—

[ভুক্তভোগীর ইতিহাস]

তিন বৎসর পূর্ব্বে বর্ষার আর্দ্র বাতাসে—আমার সর্দ্দী কাসি আরম্ভ হয়। ১০।১২ দিনেও যখন কাসি কমিল না, তখন আমাদের ফ্যামিলি ডাক্তারকে ডাকা হয়। ডাক্তার আসিয়া বলেন—"ও সামান্য ব্রঙ্কাইটিস্—দুইদিনে সারিয়া যাইবে।" কিন্তু

আমার ভাগ্যদোষে—দুই দিনের স্থানে দুই বৎসরেও রোগ সারিল না। স্থান-পরিবর্ত্তন, পেটেণ্ট ঔষধ সেবন—কিছুই বাকি থাকিল না। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার স্ত্রী কত দেশ হইতে কত মাদুলী আনাইয়া আমার কটী কণ্ঠ ও বাহু-যুগলে ঝুলাইয়া দিলেন, কত জাগ্রত দেবতার পাষাণ মন্দিরে 'ধন্না' দিয়া আসিলেন, কত "সোমবার" "মঙ্গলবার" "রবিবার" করিলেন, তাঁহার একাগ্র কামনা সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। কত 'কফ রেমিডি' 'কডলিভার' অতলে ডুবিল। আমার দেহ ও দিন দিন অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়া পড়িল। গৃহে অবিবাহিতা দুই কন্যা—নিজে সামান্য কেরাণীগিরি করিতাম—পৈতৃক সম্বল কিছুই নাই—ছুটির অর্দ্ধ বেতনে সংসারই চলে না, কাজেই সজল নেত্রে সেই অগতির গতি ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলাম।

এই সময় আমার এক মাতুল পুত্র আসিয়া বলিলেন—"দাদা! দিন কতক কবিরাজী চ্যবনপ্রাশ খাইয়া দেখনা কেন?" গৃহিণীও তাহার মতে সায় দিলেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন পড়িয়া ভিঃ পিঃ ডাকে ঔষধ পাঠাইতে পত্র লিখিলাম। ৫।৬ দিন পরে দিব্য চক্‌চকে টিনের কৌটায় ভরা লেবেল আঁটা, ব্যবস্থাপত্র সম্বলিত নিকষ-কৃষ্ণ মেঘের বর্ণ 'চ্যবনপ্রাশ' আমার হস্তগত হইল। আমি আশ্বস্ত হৃদয়ে "চ্যবনপ্রাশ" সেবন আরম্ভ করিলাম। চ্যবণপ্রাশের গুণাবলী পাঠ করিয়া মনে হইল—এমন চমৎকার ঔষধ থাকিতে এতদিন বৃথাই কষ্ট পাইয়াছে। ইহার মূল্যই বা কত সুলভ—একসের ঔষধের "মূল্য ৩৲ টাকা" মাত্র। আহা! যাহারা এ ঔষধ বেচিতেছে—তাহারা প্রকৃতই নিষ্কাম ধর্ম্মী,—পরোপকারই তাহাদের জীবনের ব্রত!

একমাসে একপোয়া ঔষধ আমি খাইয়া ফেলিলাম। কিন্তু রোগের কিছুই উপশম হইল না। যাঁহারা ঔষধ পাঠাইয়াছিলেন তাঁহাদের কাছে রিপ্লাই কার্ডে পত্র লেখা হইল। উত্তর আসিল—"আপনার অসুখ অনেক দিনের, আরও কিছু দিন চ্যবনপ্রাশ সেবন করুন"। কথাটা সম্ভব বলিয়াই বিশ্বাস হইল। তৎক্ষণাৎ অর্ডার দিলাম আবার ঔষধ আসিল। আবার একমাস খাইলাম; কিন্তু রোগের অবস্থা "যথা পূর্ব্বম্ তথা পরং"! আবার পত্র লিখিলাম, শরীরের অবস্থার কথাও জানাইলাম। এবার চ্যবনপ্রাশের সঙ্গে এক রকম ঔষধ আসিল, তাহার নাম "চন্দ্রামৃত", ভাবিলাম—একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব তায় মিতে—আর আমার ভয় কি? এবার নিশ্চয়ই ভাল হইব। আমি আশায় বুক বাঁধিলাম। পত্নীর মুখ প্রফুল্ল হইল। আমাদের ভাগ্য-দেবী, অলক্ষ্যে একবার হাসিয়া লইলেন।

এই "চ্যবনপ্রাশ" ও "চন্দ্রামৃত"—ভক্তিপূর্ব্বক ৬ মাস কাল যথাবিধি সেবন করিলাম! ইহাতে লাভ এই হইল—আমলকী পিণ্ড খাইয়া খাইয়া আমার পেটের অসুখ দেখা দিল। দিনে রেতে ১০।১৫ বার করিয়া আমসংযুক্ত তরল ভেদ হইতে লাগিল। মাতুল পুত্র আমার অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তখন স্থির হইল—"চ্যবনপ্রাশ" বিক্রেতার সঙ্গে—মাতুল পুত্র সাক্ষাৎ করিবেন। আমার এমন শক্তি ছিল না যে আমি নিজে যাই।

মাতুল পুত্র সন্ধ্যার পর ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখে সংবাদ পাইলাম—"চ্যবনপ্রাশের" কারখানার মালিক আমার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন। তাঁহার ঔষধালয়ে ৫।৭ জন বৈদ্য কর্ম্মচারী আছেন, তাঁহারা এক একজন ঋষিতুল্য ব্যক্তি, আমার এই অসুখটা আরাম করিবার জন্য—তাঁহাদের অনন্ত—গবেষণা—প্রসূ বিরাট মস্তিষ্ক আন্দোলিত হইয়াছে। সেই আন্দোলনে—মহাসিন্ধু—আলোড়নে অমৃত উত্থানের মত 'শঙ্খবটী' ও "ভুবনেশ্বর" নামক দুইটী অমৃত আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পেটের অসুখ না সারা পর্য্যন্ত আমি ঐ দুইটী ঔষধ আপাততঃ খাইব। তাহার পর আবার চ্যবনপ্রাশও চলিবে! আত্মীয় জনের অনুরোধে পড়িয়া—'শঙ্খবটী' ও "ভুবনেশ্বর" ৬ দিন সেবন করিলাম। আমাশয় বাড়িতেই লাগিল। শেষে ডাক্তার আসিয়া—'বিষমথ্' খাওয়াইয়া অকূলে কূল দেখাইয়া দিলেন। সে যাত্রা তাহাতেই বাঁচিয়া গেলাম। ঔষধ খাওয়া বন্ধ করিয়া দিলাম।

কিন্তু বেশীদিন চুপ্ করিয়া থাকা ভাল বোধ হইল না। কেন না—কাসি তখন বৃদ্ধি পাইয়া বারাণসীতে দাঁড়াইয়াছে। প্রতিবাসীরা পরামর্শ দিলেন—"একবার কলিকাতায় গিয়া কবিরাজ দেখাও।" বলাবাহুল্য আমাদের পল্লীগ্রামে একজনও কবিরাজ ছিল না।

কলিকাতায় গিয়া—একজন নামজাদা কবিরাজের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আমার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"ভরসার মধ্যে জ্বর নাই। আপনি ভাল হইবেন।" তাঁহার ঔষধে আমার বিশেষ উপকার হইল। কিন্তু তিন সপ্তাহ পর্য্যন্ত,—অতি কষ্টে দাম যোগাইয়াছিলাম, আর পারিলাম না। কবিরাজ মহাশয়কে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাঁহার সহকারী এক ছাত্রকে বলিলেন—"এই ভদ্রলোক বড় গরীব, ইহাকে আধপোয়া চ্যবনপ্রাশ দাও—একটী টাকার বেশী মূল্য লইওনা।"

চ্যবনপ্রাশের নাম শুনিয়া ঘৃণায় আমার মুখ বিবর্ণ হইল। আমি বলিয়া ফেলিলাম—"দোহাই আপনার, আমায় 'চ্যবনপ্রাশ' আর দিবেন না। আমি তিন টাকা সেরের চ্যবনপ্রাশ—৯ মাস /২।০ পোয়া খাইয়াছি। তাহাতেই আমার পেট ভাঙ্গিয়াছিল। আপনি দয়া করিয়া আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, চ্যবনপ্রাশ দিয়া আর আমায় হত্যা করিবেন না।" কবিরাজ মহাশয় কৌতূহলী হইয়া—আমার চ্যবনপ্রাশ সেবনের ইতিহাস আনুপূর্ব্ব শুনিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে—তাঁহার ঔষধালয়ের সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই একটী টীনের কৌটা আমার হস্তে দিয়া বলিলেন—'এই ঔষধ আপনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আধতোলা ওজনে সেবন করিবেন। ঔষধ সেবনের পর একটু উষ্ণ দুগ্ধ পান করিবেন।" আমি তাঁহার কর্ম্মচারীর হাতে একটী টাকা দিয়া কৌটাটি লইয়া বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন ঔষধ খাইতে গিয়া দেখিলাম—কৌটার গাত্রে নাম লেখা রহিয়াছে—"ভার্গ্যাদি লেহ" কিন্তু ভিতরে সেই মসীকৃষ্ণ পিণ্ডাকার ঠিক চ্যবনপ্রাশের মতই

কিম্ভূত কিমাকার বস্তু! মনে সন্দেহ হইল—"চ্যবনপ্রাশই" বুঝি "ভার্গ্যাদি লেহ" নাম ধরিয়া আবার এই ভক্তাধমকে ছলনা করিতে আসিয়াছেন! হে অখণ্ড মণ্ডলাকার চ্যবনপ্রাশ! তুমি কি আমায় ছাড়িবে না?

পত্নী—আমার কোনও কথা শুনিলেন না, তিনি জোর করিয়া আমায় ঔষধ খাওয়াইলেন। বলিলেন—"এ চ্যবনপ্রাশ নয়, অন্য ঔষধ—তুমি খাও। কবিরাজদের কাছে—একরকম চেহারার অনেক ঔষধ থাকে"

আমি ঔষধ খাইতে লাগিলাম। দুই তিন দিন পরেই ক্ষুধা বৃদ্ধি হইল, বেশ কোষ্ঠ পরিষ্কার হইতে লাগিল। একটু বলও যেন পাইলাম, ১০।১৫ দিন পরে—সকাল সন্ধ্যায় মাঠে দুই এক মাইল বেড়াইতে পারিলাম, ঔষধের উপর বড় ভক্তি হইল। কৌটাটি নিঃশেষ হইলে আবার একদিন কবিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। একটী টাকা তাঁহার আসনের সম্মুখে রাখিয়া বলিলাম—"আমাকে আর একটু "ভার্গ্যাদি লেহ" দিন।" কবিরাজ মহাশয় হাস্য মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেমন চ্যবন প্রাশে উপকার হইয়াছে কিনা? বল পাইয়াছেন কিনা?" আমি বলিলাম—চ্যবন প্রাশতো আমি খাই নাই। আপনি প্রথমে চ্যবন প্রাশ ব্যবস্থা করিয়া দিলেন বটে:—কিন্তু শেষে আমাকে "ভার্গ্যাদি লেহ" দিয়াছেন। উহাতে আমার বিশেষ উপকার হইয়াছে। কাসি—একদম নাই, ক্ষুধা ও বল বাড়িয়াছে। মনে হই-হইতেছে—এইবার ভাল হইয়া গিয়াছি।

কবিরাজ মহাশয় বলিলেন—হাঁ—আপনি এবার ভাল হইয়া গিয়াছেন। চ্যবন প্রাশ আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে একটি উল্লেখ যোগ্য মহৌষধ। আপনার চ্যবন প্রাশে অভক্তি দেখিয়া—"ভার্গ্যাদি লেহ" নাম দিয়া, আমি আপনাকে সেই চ্যবন প্রাশই দিয়াছি। শুধু আপনি কেন? অনেকের মুখেই আমরা চ্যবন প্রাশের নিন্দা শুনিতে পাই, চ্যবন প্রাশের নকলে—দেশ ছাইয়া গিয়াছে। কাজেই অনেক স্থলে—আসল চ্যবন প্রাশকে নকল নাম দিয়া—আমরা ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হই।"

আমি অবাক্ হইয়া বৈদ্যরাজের মুখের পানে চাহিয়া রহিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—আমাদের দেশে যেমন খাদ্য দ্রব্যগুলি ভেজালে পূর্ণ হইয়াছে,—জীবন রক্ষক ঔষধের ভিতরেও কি তেমনি ভেজাল চলিতেছে? শাস্ত্রীয় ঔষধের ভিতরেও এত প্রতারণা? দরিদ্র বাঙ্গালী জাতিকে—অল্প মূল্যের প্রলোভন দেখাইয়া—এমন সর্ব্বনাশ কি করিতে আছে?

হায়!—আমার এ কথা—কোন্ হৃদয়বান্ ভাবিয়া দেখিবেন? যাহারা বড়ী বেচা বাড়ির মহিমা বুঝিয়াছে, তাহারা আমার মত লোকের অনুরোধে—"ধর্ম্মের কাহিনী" শুনিবে কেন? তাহাদের ব্যবসায়ের "মূল" যে অক্ষয় বটের মত বহু শাখা প্রশাখায় দেশ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে।

এবার অতি বর্ষার ফলে—অনেকেই কফ রোগে আক্রান্ত হইতেছেন, সম্মুখে—শীত ঋতু,—অনেকেই ফুস্‌ফুস-প্রদাহ ও কাসির পীড়ায়—কষ্ট পাইতে পারেন। তাই পাছে কেহ—রামা শ্যামার অপূর্ব্ব আবিষ্কার আমলকী পিণ্ড খাইয়া "চ্যবন প্রাশ" খাইতেছি মনে করেন,—সেইজন্য আমার চ্যবন

প্রাশ সেবনের ইতিহাস আজ সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিলাম।

আমার বিশ্বাস—কবিরাজী চিকিৎসার উপর সাধারণের যেমন দিন দিন শ্রদ্ধা বাড়িতেছিল, যা'র তা'র হাতের নকল ঔষধ—সে শ্রদ্ধা আর বেশী দিন থাকিতে দিবে না। আমরা অতি পশু জাতি, একদিকে আমরা ঘৃত বলিয়া বিষ খাইতেছি, ভেজাল খাদ্য ভক্ষণে স্বাস্থ্য হারাইতেছি;—অন্যদিকে—মকরধ্বজের পরিবর্ত্তে—পারা গন্ধক মনছালের সংযোগ, চ্যবন প্রাশের পরিবর্ত্তে 'আমলকী পিণ্ড' পাইতেছি। আমাদের ঔষধ পথ্য দুইই বিগড়াইয়াছে, অতএব আমাদের ভাগ্যে—'ফলং অপ মৃত্যুঃ'

কবিরাজী ঔষধ আমাদের প্রকৃতির প্রকৃত উপযোগী। কিন্তু আমার অনুরোধ—জীর্ণ জটিল ও দুশ্চিকিৎস্য রোগে যাঁহারা কবিরাজী চিকিৎসা করাইবেন,—তাঁহারা যেন বিজ্ঞাপনের চটকে বিড়ম্বিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ নিজে না করেন। যাঁহারা—কবিরাজের বংশে জন্মিয়াছেন, কবিরাজের শিষ্য হইয়াছেন, কবিরাজী শাস্ত্র পড়িয়াছেন,—তাঁহারা ভিন্ন কবিরাজী ঔষধের গূঢ়রহস্য অপরের বোধগম্য নহে। রোগিগণ আমার এই কথা স্মরণ রাখিবেন।

আর কবিরাজ মহাশয়দের কাছে ও আবার একটী ভিক্ষা আছে।—তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেখিতেছি—কতকগুলা অর্থলুব্ধ অব্যবসায়ীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া সাধারণকে সস্তার প্রলোভন দেখাইতেছেন। তাঁহাদের জানা উচিত—শাস্ত্রীয় ঔষধ—এরূপ "হেলাফলা" সামগ্রী নহে। শাস্ত্রীয় ঔষধ—"নকড়া-ছকড়ার" নিলামী মাল নহে। শাস্ত্রীয় ঔষধ—সেই সত্য যুগ হইতে আজ পর্য্যন্ত—চিরদিন দেব-নির্ম্মাল্যের মতন পবিত্র।

অনুকরণের হনুকরণে—আয়ুর্ব্বেদের সর্ব্বনাশ করিও না। যাহারা চাকুরী জুটাইতে না পারিয়া, কবিরাজী ঔষধের ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে—তাহারা সামান্য দোকানদার, জগতে তাহারা গৌরব-প্রতিষ্ঠার ধার ধারে না, তাহারা আয়ুর্ব্বেদের মহিমা বুঝে না, তাহারা—চায়—যেন তেন প্রকারেণ কর্ত্তব্যো ধনসংগ্রহঃ।—

আর তোমরা—বৈদ্য, ঋষি—বংশধর, আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠাতা, সমাজের শিরোভূষণ, জগজ্জীবের জীবনদাতা—ক্ষুদ্র দোকানদারের সঙ্গে তোমরা কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে চাও? তাহাদের সঙ্গে তোমাদের কি তুলনা হয়?

একজন সুরসিক সাহিত্যসেবীর মুখে গল্প শুনিয়াছিলাম—পি, সি, মার "দদ্রু দমন" নামক ঔষধের প্রচার দেখিয়া,—কেবলরাম নিজ পুত্রের নাম পীতাম্বর রাখেন। তাহার সাধু উদ্দেশ্য—পি, সি- মার ঔষধটীর নাম ও মার্কা আত্মসাৎ করা। শেষে পিনাল কোর্ডের ভয়ে—"পি সি, মার দদ্রু দমন মলম" ছাপাইয়া দিলেন। এবং পি, সি, মার দোকানের পার্শ্বেই একখানি দোকান খুলিলেন। পি, সি, মারের শুধু "দদ্রু দমন"—কেবল রামের—"দদ্রু দমনের" পর "মলম" প্রত্যয়। বিক্রী দেখে কে? ইহা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে—অনেকেই দোকান খুলিতে লাগিল। 'ম্যা' সি, মার,' "পি, সি, মার" পি, চ, মার, পি, এস, মার—একে একে মাটী ফুঁড়িয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে—স্থানীয় মিউনি-

সিপালিটী সে রাস্তাটীর নাম রাখিয়াছিলেন —"দদ্রু দমন রোড"। সস্তায় চ্যবন প্রাশ বিক্রয়ের ও অনেকগুলি দোকান হইয়াছে, এই দেখিয়া আমাদেরও মনেও ভরসা হইতেছে—শীঘ্রই সহরের একটী রাস্তার নাম হইবে—"চ্যবন প্রাশ রোড।" সেই দৃশ্য দেখা পর্য্যন্ত—ভগবান্ আমাকে বাঁচাইয়া রাখুন। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় দাঁড়াইয়া—দিন কয়েকের জন্য আজ আমি জীবন ভিক্ষা চাহিতেছি।*

শ্রীকেদার নাথ মুখোপাধ্যায়।

* সত্য মিথ্যা জানি না। একজন অতি বিশ্বস্ত ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছি, তাঁহার এক বন্ধু—কেরাণীগিরির সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু চিকিৎসা কার্য্যও করিতেন। এই বন্ধু—একজন সস্তায় চ্যবন প্রাশ বিক্রেতাকে—রাঙ্গা আলু সিদ্ধ করিয়া সেই রাঙ্গা আলুপিণ্ডকে তিল তৈলে ভাজিয়া, কিঞ্চিত আমলা চূর্ণ ও পিপুল চূর্ণ সহযোগে—চ্যবন প্রাশ প্রস্তুত করিতে দেখিয়াছেন।

—লেখক।

রক্তপিত্ত।

আজকাল আমাদের দেশে দিন দিনই যেন রক্তপিত্তরোগের প্রাদুর্ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে বলিয়া অনুমান হয়। এই ভীষণ ব্যাধির আক্রমণে প্রতিবৎসর শত শত নরনারী অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন। ইহা চির বিবর্ত্তনশীল কাল-মাহাত্ম্যজনিত অথবা আহার, বিহার ও সামাজিক রীতিনীতির পরিবর্ত্তন সম্ভূত, তাহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মহাত্মাগণ বিচার করিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারেন, ফলকথা, যাহাই হউক একটা কিছু কারণ ঘটিয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। যদিও ব্যাধির হেতু নির্ণয় করতঃ তাহার পরিবর্জ্জন করাই প্রথম চিকিৎসা বলিয়া শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং রোগোৎপাদকহেতুর পরিহার ব্যতীত, আরোগ্যলাভ সম্ভবপর হইতে পারে না, তথাপি বর্ত্তমান সময়ে, দেশ ও সমাজের অবস্থা অনুসারে বিবেচনা করিলে, উক্ত কারণের পরিত্যাগ বিষয়ে, ব্যর্থ চিন্তা করিয়া হতাশ হওয়া অপেক্ষা সাক্ষাৎ কার্য্যকারণের আলোচনা অথবা ব্যাধিপ্রতীকার কল্পে সাধ্যমত কর্ত্তব্য নির্ণয় করাই সমিচীন ও সম্ভাবিত বলিয়া মনে হয়। সমাজের মতিগতি শিক্ষার অপ্রতিবিধেয় সংস্কার, কাল মাহাত্ম্যের অলঙ্ঘনীয়তা প্রভৃতি দুরতিক্রমনীয় কারণে যাহা ঘটিবার তাহাকে কে প্রতিরোধ করিবে? তথাপি যতদূর সাবধানতা অবলম্বন করা সম্ভবপর হইতে পারে, তৎপ্রতি সকলেরই মনোযোগ কর্ত্তব্য। ইহাতে সম্পূর্ণভাবে না হইলেও সমাজের ও দেশের কতকটা উপকার সাধিত হইতে পারে বর্ত্তমান সময়ে আমাদের জীবনযাত্রা, যেমত কার্য্য শৃঙ্খলার দ্বারা আবদ্ধ, তাহাতে শাস্ত্রীয় বিধির অনুসারে যথাযথ আচার ব্যবহার সর্ব্বসাধারণ পক্ষে কখনই সম্পাদ্য হইতে পারে না; সুতরাং তন্নিবন্ধন শারীরিক বা মানসিক বৈষম্য যাহা ঘটিবে, তাহা প্রতিরোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই, কিন্তু, তথাপি আমরা যদি অবান্তর ও প্রতিবিধান-

যোগ্য কারণগুলির প্রতি সাবধান থাকি, তাহা হইলেও অনেকটা সুখ শান্তিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইতে পারিব, সেই অভিপ্রায়েই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

রক্ত ও পিত্ত উভয়ের প্রকোপজনক যে সমস্ত কারণ, তাহা অত্যধিক পরিমাণে সেবিত হইলে রক্তপিত্ত রোগ জন্মিতে পারে। সাধারণতঃ অতিরিক্ত কটুদ্রব্য (মরিচ, পিপুল প্রভৃতি) অম্ল ও লবণরস-যুক্ত বস্তু, আদা, রসোন প্রভৃতি তীক্ষ্ণবীর্য্য পদার্থ, ক্ষারপদার্থ, অধিক রৌদ্র বা অগ্নি-সন্তাপ, অতিরিক্ত পথপর্য্যটন, গুরুতর শোকপ্রাপ্তি, অপরিমিত ব্যায়াম, অধিক স্ত্রীসংসর্গ প্রভৃতি কারণে পিত্তের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তি-কারণ বশতঃ বিদগ্ধভাবাপন্ন পিত্ত যদি এই সমস্ত হেতু জন্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে শরীরস্থ যাবতীয় রক্তকেও কুপিত ও বিদগ্ধ করে, এবং দ্রবত্বভাববশতঃ ঐ রক্ত ও পিত্ত উভয়েই মিলিত ও সমবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাবয়বে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। পিত্তের বৃদ্ধির সহিত ঐ দুষ্ট রক্তও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যেহেতু পিত্তই রক্তোৎপাদনের কারণ। সুতরাং তাহার প্রকোপ, দুষ্টি, ও বৃদ্ধিতে রক্তও কুপিত, দুষ্ট ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ইহা স্বতঃসিদ্ধ। এবম্বিধ পিত্ত ও রক্ত প্রমাণাতিরিক্ত রূপে সঞ্চিত হইলে, রক্তবাহি শিরাসমূহের দ্বারা নাসা, কর্ণ, মুখ, পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ, গুহ্যদ্বার প্রভৃতি স্থান হইতে বাহিরে নির্গত হইতে থাকে। এই অবস্থাপন্ন ব্যাধির নাম রক্তপিত্ত।

এই রোগের উৎপত্তির প্রথমাবস্থায় নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি প্রায়ই উপস্থিত হয়, যথা মস্তকে ভারবোধ, আহারে অরুচি, শীতল বস্তু ব্যবহারে অভিলাষ, ধূমবৎ উদ্গার, বমি, নিজের বমন দর্শনে ঘৃণাবোধ, কাস, শ্বাস, ভ্রমি, শরীরের অবসন্নতা, মুখ ও নাসিকামধ্যে লৌহ, রক্ত বা মৎস্যের ন্যায় গন্ধানুভব, চর্ম্ম, চক্ষু, মল ও মূত্রাদিতে হরিদ্রা, রক্ত কিম্বা পীতবর্ণতা, স্বপ্নাবস্থায় সমস্ত দৃশ্যে রক্তবর্ণ দর্শন। উক্ত লক্ষণ-গুলি প্রকাশ পাইলেই অচিরভাবী রক্ত-পিত্তের আবির্ভাব বুঝিতে পারাযায়, এই জন্য এই সমুদয় লক্ষণ রক্তপিত্ত রোগের পূর্ব্বরূপ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

রক্তপিত্ত, উর্দ্ধ, অধঃ ও উভয়মার্গ ভেদে তিন প্রকার জন্মিয়া থাকে। উর্দ্ধ-গত রক্তপিত্তে নাসিকা, চক্ষু, মুখ ও কর্ণ দ্বারা রক্ত নির্গত হয়, অধোগত রক্তপিত্তে পুরুষাঙ্গ, যোনিদেশ ও গুহ্যদ্বার হইতে এবং উভয় মার্গগত রক্তপিত্তে একদা উক্ত উভয়বিধ মার্গ দ্বারা রক্ত বহির্গত হয়। রক্তপিত্ত রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সমস্ত রোমকূপের ছিদ্র হইতেও রক্ত নির্গত হইয়া থাকে।

মুখ নাসিকাদির দ্বারা অমিত রক্তস্রাব, তৎসহচরিত জ্বর এবং রোগীর পাণ্ডুবর্ণতাদি লক্ষণ দেখিয়া আজকাল কোন কোন চিকিৎসক এই ব্যাধিকে ক্ষয়জ ব্যাধি মনে করতঃ বিষম ভ্রমে পতিত হয়েন, বস্তুতঃ রক্তপিত্ত রোগের সহিত যক্ষ্মা শোষ প্রভৃতি ক্ষয়জনিত ব্যাধির কোন কার্য্য কারণতা সম্বন্ধ নাই। এই রোগে যে রক্ত নিঃসৃত হয় তাহা সমস্ত রক্ত নহে, অধিকাংশই রঞ্জিত পিত্ত ও কতকাংশ দূষিত রক্ত। এ বিষয় রোগের উৎপত্তি বর্ণনকালেই বলা

হইয়াছে, পিত্তের বিকৃতি দোষেই বিকৃত ও পিত্তযুক্ত উদ্রিক্ত রক্তগুলি নিঃসৃত হইয়া থাকে। বাস্তবিক যদি ঐ রক্ত শরীরস্থ বিশুদ্ধ রক্তধাতু হইত তবে তৎপরিমিত রক্তস্রাবে রোগী অত্যল্প সময় মধ্যেই নিতান্ত অবসন্ন বা মৃত্যুমুখে পতিত হইত, সন্দেহ নাই। রক্তপিত্তে সময়ে সময়ে এক-সের বা ততোধিক পরিমাণে রক্তস্রাব দৃষ্ট হইয়া থাকে, রোগী যদিও স্রাবসমকালে কতকটা অবসন্নতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সুপথ্য ও যথোচিত পরিচর্য্যাদিগুণে, সে অবস্থা দীর্ঘ সময় থাকে না।

আরও দেখা যায়, অনেক সময়ে রক্ত বা পিত্তের শমনকারী সাধারণ মুষ্টিযোগ ঔষধ ২।৪ বার সেবনেই রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, রোগী অল্পকাল মধ্যেই পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ও স্বচ্ছন্দতা লাভ করিতে সমর্থ হয়। ক্ষয়জনিত রোগে ঈদৃশ পরিবর্ত্তন কথনই সম্ভবপর হইতে পারে না, ইহা সাধারণ জ্ঞানেই বুঝিতে পারা যায়। যদিও "কাসোজ্বরোরক্তপিত্তং ত্রিরূপেরাজযক্ষ্মণি" এই ভোজোক্ত বচন-প্রমাণে যক্ষ্মারোগ মধ্যে রক্তপিত্ত ও একটা লক্ষণ স্বরূপ কথিত হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে উহা দ্বারা রক্তপিত্তের রাজ-যক্ষ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না,—বরং স্বতন্ত্রতাই বুঝা যায়, তবে যক্ষ্মারোগের সহিত রক্ত-পিত্তাদি রোগ সংসৃষ্ট হইলে উহা অতি দুঃসাধ্য হয়, কিন্তু রক্তপিত্তে যদি কাসি বা জ্বর বর্ত্তমান থাকে, তাহা কথনই রাজযক্ষ্মা নামে অভিহিত বা অসাধ্য বলিয়া পরিগণিত নহে।

সর্ব্ববিধ রক্তপিত্ত মধ্যে উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। কারণ উক্ত রোগে পিত্তের সহিত কফের অনুবন্ধ থাকে। পিত্ত-দোষ নিবারণের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বিরেচনই প্রধান ঔষধ, অথচ বিরেচন প্রয়োগে উর্দ্ধগত রক্তপিত্তে যে কফের অনুবন্ধ থাকে তাহারও উপশম হয়, অধিকন্তু তিক্তকষায়-রসবিশিষ্ট বিবিধ ঔষধ পথ্যাদির প্রয়োগে ঐ পিত্ত ও শ্লেষ্মাকে সহজে উপশমিত করা যায়। অনেক সময়ে একমাত্র বিরেচন প্রয়োগেই এ অবস্থায় বিশেষ উপকার দেখা গিয়াছে।

এতৎ সম্বন্ধে চরক সংহিতায় উক্ত হই-য়াছে যে—

"সাধ্যং লোহিত পিত্তং তৎ যদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যতে
বিরেচনস্য যোগিত্বাৎ বহুত্বাদ্ভেষজস্য চ।
বিরেচনং হি পিত্তস্য জয়ার্থে পরমৌষধং।
যশ্চ তত্রানুগঃ শ্লেষ্মা তস্য চানধমংস্মৃতম্॥
ভবেদ্ যোগাবহং তত্র কষায়ং তিক্তমেবচ।
তস্মাৎ সাধ্যতমং রক্তং যদূর্দ্ধং প্রতিপদ্যতে"॥

অর্থাৎ—উর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত বিরেচনোপযোগী বলিয়া সাধ্য হইয়া থাকে। বিশেষতঃ উহার প্রতিবিধানার্থ নানাবিধ পিত্তকফনাশক যোগবাহী ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে, পিত্তদোষ হরণে বিরেচনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা, উহাতে পিত্ত ও তৎসংসৃষ্ট শ্লেষ্মার ও উপশম হয় সুতরাং উর্দ্ধগরক্তপিত্তী সহজেই আরোগ্যলাভ করে।

অধোমার্গরক্তপিত্ত প্রায়ই যাপ্য (অর্থাৎ যথোপযুক্ত ঔষধ পথ্যাদি প্রয়োগে সাম্য-ভাবে) থাকে। এই রোগে পিত্তের সহিত বায়ুর অনুবন্ধ থাকায় প্রধানতঃ মধুর রস-বিশিষ্ট ঔষধপথ্যই উপযোগী। যদিও এ অবস্থায় বমনের দ্বারা চিকিৎসার বিধান উক্ত আছে, কিন্তু বমন ক্রিয়া সঞ্চিত পিত্তনাশে উপযোগী হইলেও পিত্তদোষ হরণে বিশেষ

ফলপ্রদ নহে। পিত্তহর তিক্তকষায় রস বায়ুর প্রকোপজনক সুতরাং ইহাতে প্রয়োগ করা যায় না। অপরন্তু এ অবস্থায় যে বায়ুর অনুবন্ধ থাকে, বমন দ্বারা তাহার উপশম হওয়া সম্ভবপর নহে। সুতরাং বায়ু ও পিত্তের উপশমকারী মধুররসাদিযুক্ত ঔষধ ও পথ্যাদি প্রয়োগে এবং অনুকূল স্বাস্থ্যকর দেশে অবস্থানাদির দ্বারা যতদূর সম্ভবপর হয় উক্ত ব্যাধিকে উপশান্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে।

উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত রোগ প্রায়ই অসাধ্য হয়। রোগজনক দোষ সমূহের পরস্পর বিপরীত ধর্ম্মবশতঃ একের প্রতীকারে অন্যের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, সুতরাং ঔষধাদির প্রয়োগে বিশেষ সুফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব এ অবস্থায় দোষের বলাবল বিবেচনা পূর্ব্বক যথাযথ ঔষধ পথ্যাদির ব্যবস্থা দ্বারা রোগীকে কোন প্রকারে সাম্যাবস্থায় রাখাই চিকিৎসকের কর্ত্তব্য।

রক্তপিত্তে দোষের ও সাধ্যাসাধ্যত্বের পরিচয়।

উর্দ্ধগামী রক্তপিত্ত শ্লেষ্মসংসৃষ্ট। অধোগত রক্তপিত্ত বাতানুগত এবং উভয় মার্গগত রক্তপিত্ত, কফ-বাতানুগত হইয়া থাকে।

১। এক মার্গগামী (এস্থলে টীকাকার উর্দ্ধগামীকেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই মতই সর্ব্বসম্মত ও সমীচীন) রক্তপিত্ত যদি প্রবল স্রাবযুক্ত না হয় ও রোগী সবল থাকে এবং শিশির বসন্তাদি সুখকর সময়ে যদি চিকিৎসার সুযোগ ঘটে ও রক্তপিত্তোক্ত উপদ্রবগুলি যদি উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে সুখসাধ্য হয়।

২। এক দোষানুগত রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষানুগামী যাপ্য এবং সর্ব্বদোষযুক্ত হইলে অসাধ্য হয়।

৩। অগ্নিমান্দ্যরোগীর প্রবল বেগযুক্ত রক্তপিত্ত অসাধ্য।

৪। অন্য ব্যাধির দ্বারা ক্ষীণদেহ, বৃদ্ধ, অরুচিবশতঃ যথোচিত ভোজনে অসমর্থ ব্যক্তির রক্তপিত্ত অসাধ্য।

৫। যে সমস্তদৃশ্যপদার্থ বা নভোমণ্ডল রক্তবর্ণময় দর্শন করে, তাদৃশ রক্তপিত্ত রোগী অসাধ্য।

৬। রক্তপিত্তে যদি রোগীর চক্ষু লোহিত বর্ণ হয় এবং বমন বা উদ্গার সময়ে সমস্তই রক্তবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তাহাকেও অসাধ্য বুঝিতে হইবে।

রক্তপিত্তের উপসর্গ।

দৌর্ব্বল্য, শ্বাস, কাস, জ্বর, বমন, মত্ততা, শরীরের পাণ্ডুবর্ণতা, দাহ, মূর্চ্ছা ভুক্তান্নের বিদাহ, সর্ব্বদা অধীরভাব, বক্ষঃপ্রদেশে প্রবল ব্যথা, পিপাসা, তরল মলভেদ, মস্তকে সন্তাপবোধ, মুখ ও নাসিকার দ্বারা দুর্গন্ধযুক্ত শ্লেষ্মার নিঃসরণ, ভোজনে অরুচি, অন্নের অপরিপাক। এই সমস্ত উপদ্রবের ন্যূনতা ও আধিক্য অনুসারে রক্তপিত্ত কষ্টসাধ্য এবং অসাধ্য হয়। যদি উপদ্রব একেবারেই না থাকে তবে সুখসাধ্য হয়। ইহাব্যতীত উক্ত রোগের সাধ্যাসাধ্যত্ব নির্ণয়ের জন্য প্রস্রুতরক্তের ও প্রকারভেদ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা করা কর্ত্তব্য। যথা—এইরোগে রক্তেরবর্ণ মাংসধোয়া জলের ন্যায় অথবা কর্দ্দমার্দ্র জলের তুল্য হইলে

কিম্বা বসা, পূয, বা যকৃৎ খণ্ডেরন্যায় রক্ত নির্গত হইলে উহা অসাধ্য। যদি পক্ক জামফলের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, বা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, নীলবর্ণ অথবা ইন্দ্রধনুর মত নানাবর্ণ বিশিষ্ট রক্তস্রাব হয় তাহা হইলে ও উহা অসাধ্য হইয়া থাকে। প্রস্রুত শোণিতের গন্ধ যদি শবের (মৃতদেহের) গন্ধবৎ অনুভূত হয় তবে উক্ত রক্তপিত্তও অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে। বারান্তরে আমরা রক্তস্রাবমূলক অন্যান্য রোগের সহিত রক্তপিত্তের পার্থক্য নির্দ্দেশ এবং রক্তপিত্তের চিকিৎসা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

(ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীঅমৃতলাল কবিভূষণ কাব্যতীর্থ।

ম্যালেরিয়া ও বিষমজ্বর।

—— ঃ০ঃ ——

অধুনা বাঙ্গালার পল্লীগুলি শুধু ম্যালেরিয়ায় উৎসন্ন যাইতেছে না, ম্যালেরিয়ার সহিত কালাজ্বরও বাঙ্গালার পল্লীগুলিতে প্রবেশ করিয়াছে। অনেক সময় এই দুইটি জ্বরে ভেদ নির্ণয় করা বাহ্যিক অবস্থা দেখিয়া বড় শক্ত হইয়া পড়ে,—অনেক চিকিৎসককেই এজন্য বিভ্রাটে পড়িতে হয়। সঠিক অবস্থা বুঝিতে না পারিয়া অনেকে কালাজ্বরকেও ম্যালেরিয়া জ্বর মনে করিয়া সেই ধরণের চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু যথোপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে যেরূপ চিকিৎসককেও ব্যর্থ মনোরথ হইতে হয়, সেইরূপ অচিকিৎসায় রোগীর অবস্থাও ক্রমশঃ শোচনীয় হইয়া উঠে। এজন্য ম্যালেরিয়ায় অগ্রে রোগনির্ণয় ভালরূপে করিয়া তাহার পর চিকিৎসায় হস্তক্ষেপ করা উচিত।

আমরা গতবারে বলিয়াছি—ম্যালেরিয়া-জীবাণু পররূহ উদ্ভিদ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা রক্ত কণিকার ভিতর এক পার্শ্বে অবস্থিতি করে। জীব শরীরে রক্তের তিনটি বিভাগ,—একটি রক্তকণিকা, একটি শ্বেতকণিকা ও অপরটি জলীয় পদার্থ। ম্যালেরিয়ার আক্রমণে রক্ত ও শ্বেত কণিকা—উভয়ই তুল্যরূপে ধ্বংস হইতেছে—পরীক্ষা করিলে বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু কালাজ্বরে শ্বেত কণিকাই বেশী ধ্বংস হইয়া থাকে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন,—কালাজ্বরে শ্বেত কণিকা $\frac{১}{১০০০}$ হইতে $\frac{১}{৬০০}$ পর্য্যন্ত কমিয়া গিয়া থাকে। শ্বেত কণিকাগুলি রক্তের ভিতর অবস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদাই আমাদের দেহ রক্ষার কার্য্য করিতেছে কাজেই উহারা কমিয়া গেলে শরীর নানারূপ ব্যাধি সঙ্কুল হইয়া পড়ে।

ম্যালেরিয়ার সকল জীবাণু এক রকমের নহে। সাদাসিদা জ্বর একরূপ জীবাণু হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। আর এক রকমের জীবাণু হইতে সাংঘাতিক জ্বরের উৎপত্তি হয়। সহজ জ্বর-জীবাণু আবার

কয়েক রকমের জ্বর উৎপন্ন করিয়া থাকে,—এক রকম প্রাত্যহিক, এক রকম তৃতীয়ক ও এক রকম চতুর্থক। ইহার নিদান আমরা অনেকটা বিষম-জ্বরের মত দেখিতে পাই। "রোগ বিনিশ্চয়" গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে—

"দোষোল্লো হহিত সংভূতো জ্বরোৎ সৃষ্টস্য বা পুনঃ।
ধাতুমন্যতমং প্রাপ্য করোতি বিষমজ্বরম্॥"

অর্থাৎ জ্বর-মুক্তির পর দেহের ক্ষীণতা থাকিতে অবৈধ আহার বিহার করিলে অনতি বল দোষও প্রবৃদ্ধ এবং বায়ু কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া রস রক্তাদি কোন ধাতুকে আশ্রয় করিয়া বিষমজ্বর উৎপাদন করে।

বর্ত্তমান সময়ে সেকালের মত রস পরিপাক করাইয়া চিকিৎসার বিধি একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। এমতাবস্থায় ম্যালেরিয়া জ্বর বা বিষমজ্বর উপস্থিত হইবার কারণ তো যথেষ্টই রহিয়াছে। তা' ছাড়া কখন কখন প্রথম হইতেই বিষমজ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে—ইহার প্রমাণও চিকিৎসা গ্রন্থে পাওয়া যায়, সুতরাং ম্যালেরিয়া জীবানু রক্তকণিকায় মিশ্রিত হওয়ার জন্যই বিষমজ্বর বা ম্যালেরিয়া জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে—একথা বলা যাইতে পারে।

"রোগ বিনিশ্চয়" গ্রন্থে সতত, সন্তত, অন্যেদ্যুষ্ক, তৃতীয়ক, চতুর্থক—এই কয় শ্রেণীতে যে বিষমজ্বরের বিভাগ করা হইয়াছে, ম্যালেরিয়া জ্বরের লক্ষণ সম্বন্ধেও তাহার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহজ জ্বর-জীবানু হইতে অন্যেদ্যুষ্ক বা প্রাত্যহিক জ্বর এবং তৃতীয়ক ও চতুর্থক জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। আর এক প্রকার জীবানু সততক ও সন্তত জ্বরের উৎপত্তি করিয়া থাকে। সততক জ্বরের জীবানু সুরঞ্জিত, এজ্বর অতি সাংঘাতিক; ইহার অপর নাম দ্বৈকালিক,—এ জ্বর দিনে একবার ও রাত্রিতে একবার অথবা কেবল দিনেই দুইবার বা রাত্রিতেই দুইবার হইয়া থাকে। এ জ্বরের চিকিৎসা বিশেষ বিবেচনা করিয়া করা উচিত।

যে জ্বর সাতদিন, দশদিন ও দ্বাদশ দিন নিয়ত ভোগ করে তাহার নাম সন্তত। এ জ্বরটি বিষমজ্বর কি না, সে সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ-বেত্তাদিগের মধ্যে মতভেদ থাকিলেও বর্ত্তমানের ম্যালেরিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ যথেষ্ট নিহিত রহিয়াছে।

দোষ রসস্থ হইয়া সন্তত জ্বরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই জ্বরে দেহের গুরুতা, বমনেচ্ছা, অবসাদ, বমি, অরুচিও চিত্তের ক্লান্তিভাব প্রকাশিত হয়। যে ম্যালেরিয়া জ্বরে দশ দিন বা দ্বাদশ দিন নিয়ত কাল ভোগ হইয়া থাকে, সে জ্বরের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় আমরা ইহাকে বিষম জ্বরের অন্তর্গত সন্তত জ্বর বলিয়া গণ্য করিতে পারি।

দোষ রক্তস্থ হইয়া সততজ্বরের উৎপত্তি হয়। এই জ্বরে মুখ হইতে রক্তোদ্গিরণ, দাহ, মোহ, বমন, বিভ্রম, প্রলাপ, পিড়কা ও তৃষ্ণা—এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরের যে অবস্থায় সমস্ত দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার করিয়া জ্বর হইতেছে দেখা যায়, সে জ্বরের লক্ষণও এইরূপ। এই জ্বরে ম্যালেরিয়া-জীবানু রক্তকণিকায় আশ্রয় করিয়া থাকে একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদ সেই

রক্তকণিকাকেই রক্তস্থ বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা গেল এশ্রেণীর ম্যালেরিয়া জ্বর ও আয়ুর্ব্বেদের বিষমজ্বর একশ্রেণীর অন্তর্নিহিত।

এইরূপ দোষ মাংসাশ্রিত হইয়া অন্যেদ্যুষ্ক, মেদোগত হইয়া তৃতীয়ক ও অস্থি মজ্জাগত হইয়া চতুর্থক জ্বর উৎপাদন করে। এই মাংসাশ্রিত বা অন্যেদ্যুষ্ক জ্বরে জানুর অধোজঙ্ঘা-মাংসপিণ্ডে অর্থাৎ পায়ের ডিমে দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নবৎ বেদনা, তৃষ্ণা, মলমূত্রের অতিপ্রবৃত্তি, বাহিরে তাপ, অন্তরে দাহ, হস্তপদাদি সঞ্চালন ও গ্লানি—এই সকল লক্ষণ যাহা উপস্থিত হয় তাহাও ম্যালেরিয়া জ্বরের উপদ্রবের সদৃশ। মেদোগত জ্বরে অতিশয় ঘর্ম্ম, পিপাসা, মূর্চ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি, গ্লানি ও অসহিষ্ণুতা,—অস্থিগত জ্বরে অস্থিসমূহে ভঙ্গবৎ বেদনা, কুন্থন, শ্বাস, মলরোধ, বমন ও হাত-পা ছোড়া,—মজ্জাগত জ্বরে অন্ধকার দর্শন, হিক্কা, কাস, শীত, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস ও হৃদয়চ্ছেদবৎ বেদনা—ম্যালেরিয়ার জ্বর বিশেষের সহিত একই প্রকারের দেখিতে পাওয়া যায়।

কালাজ্বরও আয়ুর্ব্বেদের বিষমজ্বরের অন্তর্গত কিন্তু ইহা ম্যালেরিয়ার সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন। যাহাহউক ম্যালেরিয়া জ্বরের নাম আমাদের দেশের লোকে আগে না জানিলেও ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিষমজ্বরের যে সাদৃশ্য রহিয়াছে—সে সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র নাই। সেই জন্য আমাদের মনে হয়, ম্যালেরিয়া জ্বরে যদি প্রথমেই সাবধানতাসহ আয়ুর্ব্বেদোক্ত পাচন এবং ঔষধ সকল সেবন করা যায়, তাহা হইলে রোগ আর ভীষণভাব ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু জ্বরের বিরামকালে ডাক্তারেরা যেরূপ কুইনাইন প্রয়োগে উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন, সেইরূপ আয়ুর্ব্বেদোক্ত হরিতাল প্রভৃতি তীব্র ঔষধ ব্যবহারে উহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করা উচিত, কিন্তু উহা কালাজ্বর কি না ইহা ঠিক বিবেচনা করিয়া তবে ম্যালেরিয়া নিবারণের ঔষধ দেওয়াও কর্ত্তব্য।

ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

[নিম্নলিখিত মুষ্টিযোগগুলি আমাদের বাটীতে পুরুষ পরম্পরায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সাধারণের উপকার হইবে ভাবিয়া "আয়ুর্ব্বেদে" ইহা মুদ্রিত করিলাম। এই সকল মুষ্টি যোগের মধ্যে—আমি স্বয়ং কতকগুলি পরীক্ষা করিয়াছি এবং চমৎকার ফল পাইয়াছি। আমার বিশ্বাস—পাঠকগণ ইহা ব্যবহার করিলে বুঝিতে পারিবেন, ঈশ্বরের অনুগ্রহে—কত সামান্য জিনিষে কত বড় উৎকট ব্যাধিও আরাম হইতে পারে॥

মুষ্টিযোগগুলি আমার পিতৃদেবের একখানি খাতায় লিপিবদ্ধ ছিল।]

আধ কপালে—

পেটারীর মূল ছেঁচিয়া, নেকড়ার পুঁটুলীতে বাঁধিয়া নস্য হইলে তৎক্ষণাৎ—আধ কপালে নামক শিরোরোগ নষ্ট হয়।

অনিদ্রায়—

কাকমাচী, পিপুল, মুগাই, এই তিনটী গাছের যে কোনও একটীর মূল—সূতায় বাঁধিয়া মাথায় বাঁধিলে নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে।

নিদ্রায়—

কান্দু কুড়িয়ার মূল সূতায় করিয়া মাথায় বাঁধিলে—সে দিন আর নিদ্রা হইবে না।

কাঞ্জিড়ার পাতা বাটিয়া চক্ষুর চতুর্দ্দিকে প্রলেপ দিলে—ঐ প্রলেপ যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ আর নিদ্রা হইবে না।

দন্তশূলে—

কুড়চীর ছাল বাটিয়া দাঁতের গোড়ায় দিলে তৎক্ষণাৎ দন্তশূল আরোগ্য হয়।

দাঁতের পোকায়—

হাঁচুটি কিম্বা কান্দু কুড়িয়ার শিকড় চিবাইলে দাঁতের পোকা মরে।

যে দাঁতে পোকা হইয়াছে—সেই দাঁতের পোকার স্থানে নির্জ্জল আদার রস পুরিয়া দিবে। পরে, ডানিপানার মূল চিবাইতে বলিবে। ইহাতে পোকা মরে।

দন্ত চালে—

হেজল গাছের ছাল গুঁড়া করিয়া দাঁত মাজিলে, নড়া দাঁত শক্ত হয়।

বকুলের ছাল বাটিয়া দন্তমূলে লেপ দিলে দাঁত খুব শক্ত হয়।

প্রত্যহ নীল ঝাটীর পাতা চিবাইলে দাঁত খুব শক্ত হয়।

পিপুলের মূল চিবাইলেও দাঁত শক্ত হয়।

দন্ত কড় মড়িকায়—

কান্দড়ের পাতা দুগ্ধে বাটিয়া, পদতলে রাত্রিকালে প্রলেপ দিলে দাঁত কড়মড় করা ভাল হয়।

কাস রোগে—

পিপুলের গুঁড়া ৴০ আনা, শুঁঠের গুঁড়া ৴০ আনা, সৈন্ধব লবণ ৴০ আনা। একত্রে মিশাইয়া ভোজনের প্রথম গ্রাসের সহিত প্রত্যহ খাইলে শীঘ্রই কাস রোগ ভাল হয়।

রাম বাসকের মূল।০ আনা, কাল তুলসীর পাতা ২১ খানা, মরিচ ৫টা একপোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক থাকিতে নামাইয়া গরম গরম ঠিক সন্ধ্যার সময় খাইবে। ইহাতে সকল রকম কাশি ভাল হয়।

অনুমৃতার কড়ি ১ কড়া, ছোট সবুজ রঙের মাকড়সা ১টা—একত্রে ন্যাকড়ায় বাঁধিয়া কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল রকম কাসি ভাল হয়।

প্রত্যহ ভোজন শেষে এক আনা সৈন্ধব লবণ—একটু গরম জল সহ খাইলে বহুদিনের পুরাতন কাস রোগ ভাল হয়।

রক্ত পিত্তে—

গাম্ভারীর পাকাফল ৪।৫টী চুষিয়া খাইলে তৎক্ষণাৎ মুখ দিয়া রক্ত ওঠা বন্ধ হয়। টাট্‌কা ফল না পাইলে শুষ্কফল চূর্ণ করিয়া—মধুর সহিত চাটিয়া খাইতে হইবে।

লাক্ষার গুঁড়া ৵০ আনা কিস্‌মিস্ ।০ আনা, একত্রে বাটীয়া বড়ী করিবে। এই বড়ি চুষিয়া খাইলে—রক্ত ওঠা নিবারিত হয়।

অজীর্ণে—

শুঁঠের গুঁড়া ।০ আনা, ১ ঝিনুক গরম দুগ্ধ সহ রাত্রে আহারের পর খাইলে—অজীর্ণ ভাল হয়।

আধপোয়া ডাবের জলে—১০।১২টা পুদিনার পাতা, এক আনা মৌরী, এক আনা যোয়ান, ১ কুঁচ সৈন্ধব—রাত্রে ভিজাইয়া প্রাতঃকালে সেই ডাবের জলটুকু ছাঁকিয়া খাইলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ রোগ ভাল হয়।

বায়ু শূলে—

হিজলের ফল ১টা, মরিচ ১২টা—জল দিয়া বাটীয়া খাইলে বাই শূল ভাল হয়।

প্লীহায়—

কেয়া গাছের পাতা শুকাইয়া,—হাঁড়ির ভিতর পুরিয়া, অন্তর্ধূমে দগ্ধ করিবে। সেই ক্ষার ৩ রতি, একটু মাৎ গুড়ের সহিত খাইলে প্লীহা ভাল হয়।

নিসিন্দা গাছের শিকড়ের সূক্ষ্মচূর্ণ এক আনা; এক ঝিনুক বাছুরের চোনার সহিত এক মাস কাল ব্যবহার করিবে। ইহাতে প্লীহা, যকৃৎ ও জ্বর নিশ্চয়ই ভাল হইবে।

আম বাতে—

বিছাটী গাছের পাতা ৫।৬টী গব্য ঘৃতে ভাজিয়া ভাতের সঙ্গে খাইলে আমবাত ভাল হয়।

বাতে—

শিরীষ মূলের ছাল ২ ভরি, দেড় পোয়া জলে সিদ্ধ করিয়া দেড় ছটাক থাকিতে নামাইয়া সেই ক্বাথ পান করিলে বাতের বেদনা নষ্ট হয়।

আধ ছটাক—পাকা পুঁই মেটুলী, এক পোয়া রেড়ীর তৈলে চোঁয়া চোঁয়া করিয়া ভাজিবে। সেই তৈল বাতের বেদনা স্থানে মালিশ করিবে। ২।৩ দিবসেই উপকার জানা যাইবে।

প্রমেহ—

একখানি বাতাসায় ১ ফোঁটা বটের আটা দিয়া খাইলে, ৩ দিনে মেহ রোগের জ্বালা যন্ত্রণা নষ্ট হয়।

কাবাব চিনির গুঁড়া ।০ আনা, কলমী সোরা আধ ভরি, সাদা চন্দনের গুড়া ৵০ আনা, সকলের দ্বিগুণ মিছরীর গুঁড়া দিয়া ১৭ পুরিয়া করিবে। এই পুরিয়া ২ বেলা ২টী জল দিয়া গিলিয়া খাইবে। ইহাতে মেহ, প্রস্রাবকালীন অসহ্য জ্বালা, ফোটা ফোটা প্রস্রাব হওয়া, সপূয ধাতু নির্গম প্রভৃতি উপসর্গ—সত্বর প্রশমিত হয়।

রক্তামাশায়—

বেলশুঁঠা চূর্ণ ৵০ আনা, আমের কোশী চূর্ণ ৵০ দাড়িমা ফলের গুঁড়া ৵০ শিমুল আঠা চূর্ণ ৵০, মুথা চূর্ণ ৵০ আনা, সাদা ধূনার গুঁড়া ॥৵০ আনা, একত্র মিশাইবে। ১৪টী পুরিয়া বাঁধিবে। ২ বেলা ২ পুরিয়া ছাগল দুগ্ধ অনুপানে খাইলে অসাধ্য কষ্টকর রক্ত-আমাশায়ও আরোগ্য হয়। এই ঔষধটী আমাদের বংশে প্রায় ৬০ বৎসর ধরিয়া ব্যবহার হইয়া আসিতেছে এমন চমৎকার ঔষধ প্রায় দেখা যায় না।

আম ছাল বাটীয়া, পুরু করিয়া নাভিস্থানে প্রলেপ দিলে—আমাশয় ভাল হয়।

গ্রহণী রোগে—

বকুল ছালের রস, আমছালের রস, আধ ঝিনুক পরিমাণে লইয়া ঘোলের মথিত করিয়া খাইলে গ্রহণী ভাল হয়।

শঙ্কর জটার শিকড় ।০ আনা, পাচটা গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে গ্রহণী ভাল হয়।

হারিষে—

লাল আপাং গাছের শিকড় এক আনা, বাটিয়া ইক্ষুরস সহ ভক্ষণ করিলে হারিষের রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

আফুলা শিমুলের মূল বাটিয়া ছাগল দুগ্ধে সহ সেবনে হারিষ ভাল হয়।

দন্তোৎপলের মূল ৵০, ২১ গোল মরিচ সহ বাটিয়া খাইলে রক্ত বন্ধ হয়।

বাতশিরা ও কুরণ্ডে—

মাল কাঁকড়া ঘাসের শিকড় দুগ্ধে সিদ্ধ করিয়া খাইলে, বাতশিরা ভাল হয়।

কৃমিরে পোকার বাসা—জলে গুলিয়া গরম করিয়া প্রলেপ দিলে কুরণ্ড ও একশিরার ফুলা এবং যন্ত্রণা সদ্য সদ্য কমিয়া যায়।

তৃষ্ণায়—

কাঁকড়ার গর্ত্তের মাটী লইয়া ৭টী ভাঁটা প্রস্তুত করিবে। ঐ ভাঁটাগুলি আগুনে পোড়াইতে দিবে। লাল বর্ণ হইলে চিমটায় দ্বারা তুলিয়া ভাঁটাগুলি গরম থাকিতে ২ একে একে তিন পোয়া জলে ডুবাইবে। সেই জল ছাঁকিয়া রোগিকে খাইতে দিবে। এক পোয়া আন্দাজ জল খাওয়ার পরই আর সে জল খাইতে চাহিবে না।

কলমী শাকের গাঁইট ২১টা মরিচ পাঁচটা—একত্রে বাটিয়া আধ পোয়া জলে গুলিবে। ওই জল ২।১ ঝিনুক খাইবামাত্র রোগীর অসহ্য পিপাসা নিবারিত হইবে।

হিক্কায়—

রজনী গন্ধ ফুল ৪।৫টা শিলে বাটিবে,—পরে তাহা আধ পোয়া জলে গুলিয়া, সেই জলে ২ তোলা চিনি মিশাইয়া সরবত প্রস্তুত করিবে। এই সরবত পান করিলে, অজস্র উত্থিত হিক্কাও ভাল হয়। মৃত্যুকালে—বিদ্যাসাগর মহাশয়কে খাওয়ান হইয়াছিল।

কেশের (কসার) শিকড় শুকাইয়া গুঁড়া করিবে, এই গুঁড়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে প্রবল হিক্কা নিবারিত হয়।

মূর্চ্ছায়—

ছোট্ট চাঁদরের পাতা হাতে রগড়াইয়া রোগির নাকের কাছে ধরিলে, মূর্চ্ছা ভাল হয়।

পা ফাটায়—

গুড় আধ ছটাক, সর্ষপ তৈল আধ ছটাক, সৈন্ধব লবণ ৵০ আনা, এক পোয়া চোনা—একত্রে মিশাইয়া ৭ দিন রৌদ্রে রাখিবে। চোনা শুকাইয়া গেলে মলমের মত হইবে। ইহা মাখাইলে পা ফাটা ভাল হয়।

পিত্ত বৃদ্ধিতে—

হিংচা পাকের রস ১ কাঁচ্চা, ধনের গুঁড়া /০ আনা, হরিতকী চূর্ণ /০, গুড় ।০, একত্র মিশাইয়া খাইলে, হাত পা চখ মুখ জ্বালা প্রশমিত হয়।

বায়ু বৃদ্ধিতে—

অম্ল দধি ও মাৎ গুড় একত্র মিশাইয়া—স্নানের পূর্ব্বে গাত্রে মাখিবে, পরে স্নান করিবে। ইহাতে উন্মাদ পর্য্যন্ত ভাল হয়।

স্নানের পর—পায়রার ডিমের শাঁস কাঁচা হলুদের রসের সহিত মিশাইয়া মাথায় লেপ দিলে মাথা ঠাণ্ডা হয়।

কামলা রোগে—(ন্যাবা)—

আঁকোতে মূল বাটিয়া নাশ লইবে। আমলার গুঁড়া ঘোল সহ খাইবে।

দারু হরিদ্রা—চন্দনের মত জলে ঘসিয়া খাইবে, চক্ষে কেশুরে পাতার রসের অঞ্জন দিবে। ইহাতে ন্যাবা ভাল হয়।

(ক্রমশঃ)

BENGALI TRANSLATOR'S OFFICE CALCUTTA
BENGAL LIBRARY WRITERS BUILDINGS

আয়ুর্ব্বেদ

মাসিকপত্র ও সমালোচক।

২য় বর্ষ। } বঙ্গাব্দ ১৩২৪—পৌষ। { ৪র্থ সংখ্যা।

স্বাস্থ্যকর স্থান।

[দার্জ্জিলিং]

প্রাকৃতিক পরিচয়—

ডাক্তার যখন রোগীকে কোথাও 'চেঞ্জে' যাইবার পরামর্শ দেন, তখন অনেকেই বলেন—"এটা ডাক্তারী মতের গঙ্গা যাত্রা!" কিন্তু এরূপ বিদ্রূপ—ব্যঙ্গ নিতান্ত অকারণ নহে। অনেক সময় দেখা যায়—চেঞ্জে গিয়া রোগীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতিই হইল না,—বরং রোগ বাড়িয়াই গেল, হয়ত তাহাতেই তাহাকে পৃথিবীর পান্থশালা পরিত্যাগ করিতে হইল। এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু, জল-বায়ুর পরিবর্ত্তনে নষ্টস্বাস্থ্য ফিরিয়া আসা—ইহাও ত নিত্যদৃষ্ট ঘটনা। দেশে দীর্ঘ কাল ধরিয়া রোগ ভোগ করিলে অনেক সময়—"স্থানত্যাগেন দুর্জ্জনং," এই মহানীতির বলে জল বায়ু পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস,—চেঞ্জে গিয়া যাঁহারা কোনও উপকার পান না, তাঁহারা হয়ত নিজের উপযোগী স্থান নির্ব্বাচন করিতে পারেন না। সকল স্থান সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হইতেই পারেনা। সেইজন্য আমরা সাধারণের উপকারার্থে—প্রসিদ্ধ স্থানগুলির স্বাস্থ্যকারিতার যথাসাধ্য পরিচয় দিব। ইহাতে—কোন্ স্থানে গেলে কিরূপ রোগীর উপকার হয়—সকলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দেশের প্রকৃতি-নির্ব্বাচন দোষে কাহাকেও আর বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে না।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দার্জ্জিলিংয়ের স্বাস্থ্যকারিতার উল্লেখ করিব। সম্প্রতি আমাদের এক বন্ধু রোগ-মুক্তির পর দার্জ্জিলিংয়ে হাওয়া খাইতে গিয়াছিলেন। তিন মাসের পর তাঁহাকে রুগ্ন-ভগ্ন দেহ লইয়া ক্ষুণ্ণমনে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে। বন্ধুর যেরূপ শরীর, তিনি যেরূপ ব্যাধিতে কষ্ট পাইয়াছেন,—তাঁহার দার্জ্জিলিংয়ে যাওয়াই উচিত হয় নাই। অবশ্য দার্জ্জিলিং একটী

স্বাস্থ্যকর স্থান,—কিন্তু সকলের পক্ষে দার্জ্জিলিংয়ের বায়ু শুভকর নহে।

কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০০ শত মাইল দূরে, ৭১৬৯ ফিট উচ্চে—হিমালয়ের একটী শৃঙ্গের উপর দার্জ্জিলিং অবস্থিত। যখন "দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান্ রেলওয়ে" ছিল না, তখন দার্জ্জিলিং যাওয়ার অনেকটা অসুবিধা ছিল,—পয়সা খরচও কিছু বেশী হইত। তখন শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত ট্রেণে গিয়া, পরে টোঙ্গা বা পাল্কীতে চড়িয়া দার্জ্জিলিং সহরে যাইতে হইত। এখনও প্রাচীনকালের পথের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শুনিয়াছি, বর্দ্ধমানের মহারাজগণ তখন দার্জ্জিলিং যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট সুবিধা করিয়া দিতেন। এখন দার্জ্জিলিং গমনের আর কোন কষ্ট নাই। বিকালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে—দার্জ্জিলিং মেলে চড়িলে,—একেবারেই দার্জ্জিলিং যাওয়া যায়। বিশেষতঃ পথের উভয় পার্শ্বের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গেলে পথশ্রমের কথা মনেই থাকে না।

হিমালয়ের সিকিম গিরিশ্রেণীর মধ্যে দার্জ্জিলিং। স্থানটী তত প্রশস্ত না হইলেও অসংখ্য অট্টালিকায় পূর্ণ, দেখিতে অতি সুন্দর—যেন স্বর্গের নন্দন কানন! পর্ব্বতের যে ভাগে দার্জ্জিলিং সহর রচিত হইয়াছে, সে অংশ তত উচ্চ নহে। দার্জ্জিলিংয়ের বাজার দেখিবার জিনিষ। এখানে গ্রীষ্মকাল অতিবাহিত করিবার জন্য—মহামান্য বঙ্গেশ্বরের একটী প্রাসাদ আছে। দার্জ্জিলিংয়ে বর্দ্ধমান ও কুচবিহারের মহারাজার অনেক জায়গা জমী-দেখিতে পাওয়া যায়। ভাড়াটে বাড়ীরও এখানে অভাব নাই—তবে ভাড়ার হার বড় বেশী।

দার্জ্জিলিংয়ে বৃষ্টি পতনের মাত্রাটা অতিরিক্ত, আসাম, কুচবিহার ব্যতীত ভারতের আর কোনও দেশে এত বৃষ্টি হয় না। বৃষ্টিপাতের গড় পরিমাণ ১২০ ইঞ্চি থাকে। এত বৃষ্টি—কিন্তু বৃষ্টি ধরিয়া গেলেই পথ ঘাট খুব শীঘ্র শুকাইয়া যায়। কলিকাতার মত এক হাঁটু কাদা হয় না। সকল ঋতুতেই এখানকার বায়ু আর্দ্র—শীতে ও বর্ষায় আরও অধিক। এখানে বায়ুর তাপের মাঝামাঝি পরিমাণ, ৫৯, ৫১ ও ৩৬ ডিগ্রী। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ৬৫, আষাঢ় শ্রাবণে ৭০, অগ্রহায়ণ পৌষে ৬২ ডিগ্রী হইয়া থাকে।

অতি চমৎকার পরিচ্ছন্ন সহর! ময়লা পরিষ্কারের বন্দোবস্ত এত সুন্দর যে, চক্ষে না দেখিলে বুঝানো যায় না। সহরের ড্রেণ—"রণজিৎ" নামক নদে মিশিয়াছে। জলের কল, বৈদ্যুতিক আলো—কিছুরই অভাব অপ্রতুল নাই। বাজারে সকল জিনিষই পাওয়া যায়। কিন্তু দাম বেশী। বিলাতী শাক সব্জী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রতি রবিবারে একটী হাট বসে। ভুটিয়া, নেপালী, লেপ্‌ছা, সিকিমী প্রভৃতি পাহাড়ী জাতিরা হাটের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কত ফুল, ফল, মধু, এলাচ, তরিতরকারীই যে আমদানী হয়, তাহার ইয়ত্তা হয় না।

পথে বেড়াইতে বেড়াইতে যখন,—উর্দ্ধে তুষার-মণ্ডিত অচল শ্রেণী, নিম্নে নেত্রোৎসব উপত্যকা ভূমির দিকে দৃষ্টি পতিত হয়, তখন প্রাণে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবেশ হয়। প্রভাতে ও প্রদোষে উপত্যকাগুলি তিমিরাবৃত, শিখরগুলি রবিকর দীপ্তিতে স্বর্ণোজ্জ্বল, কি রমণীয় মহান্ দৃশ্য! আপনারা

যদি সেঞ্চালের প্যারেড্ হইতে তুষারাবৃত তুহিনাচলের মধুর দৃশ্য দেখেন, বোধ হয় জীবনে তাহা ভুলিতে পারিবেন না! ঐ গিরি-শ্রেণীর উপর—২৮ হাজার ফিট উচ্চ 'কাঞ্চন জঙ্ঘা' ভীমকান্ত মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মান! পশ্চিম দিকের দৃশ্য—১২ মাইল দূরবর্ত্তী একটী পাহাড়ে অবরুদ্ধ, পূর্ব্ব দিকে তিস্তা অধিত্যকা! দক্ষিণে সেঞ্চালের নিবিড় বনালি—যেন তরঙ্গায়িত মহাসমুদ্রের ন্যায় অনন্তে মিলিয়া গিয়াছে! উত্তর দিকের দৃশ্য —উন্মুক্ত, কেবল পর্ব্বত শ্রেণী মেঘের ন্যায় থরে থরে সাজানো। ১০।১২ হাজার ফিট উর্দ্ধে আরোহণ করিয়া নেপাল ও সিকিমের মধ্যবর্ত্তী গিরি শিখরে দণ্ডায়মান হইলে দক্ষিণে অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার "কাঞ্চন জঙ্ঘা" এবং বামে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ গিরি "এভারেষ্ট" দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে "রণজিতের" স্ফটিক-স্বচ্ছ-সলিলে তিস্তা শাখার হরিৎবর্ণ বারিরাশি মিশিয়াছে—সেখানকার দৃশ্য দেখিলে মনে হয়, এতদিনে আমার মানব জন্ম সার্থক!

দার্জ্জিলিংয়ে একটী অপূর্ব্ব উদ্যান আছে —পৃথিবীর সকল দেশের উদ্ভিদ্ তাহাতে সযত্নে সংগৃহীত হইয়াছে। দার্জ্জিলিংয়ের "সিন্‌কোনা" ক্ষেত্রও দেখিবার জিনিষ। এখানে মক্ষিকা ও মধু উৎপাদনের বিস্তৃত কারবার আছে।

দার্জ্জিলিং যে কিরূপ স্বাস্থ্যকর মনোরম স্থান, তাহা বুঝাইবার জন্যই আমি প্রাকৃতিক দৃশ্যের কথঞ্চিৎ আভাষ দিলাম, নহিলে দার্জ্জিলিংয়ের সকল চিত্রফটো, কেবল ভারতের কবি কালিদাসের এবং বাঙ্গালায় কবি বিহারীলালের ক্যামেরাতেই উঠিতে পারে।

জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত, এখানে প্রবল বারিবর্ষণ হইয়া থাকে। এই সময় এখানকার স্বাস্থ্য খুব ভাল। মার্চ্চ ও মে মাসে দার্জ্জিলিংয়ের জল বায়ু ঠিক ইংলণ্ডের মত হয়। বাঙ্গালী বাবুরা এই সময় দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইতে যান। যদিও বর্ষার শৈত্যেও এখানে স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা থাকে না, তথাপি নবেম্বর মাসেই এ দেশের স্বাস্থ্য সব সময়ের চেয়ে ভাল। নবেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত—প্রায়ই ঝড়বৃষ্টি দেখা যায় না। এই সময় দিবসে সূর্য্যোদয় দেখিতে পাওয়া যায়, রাত্রে সুনীল নভোমণ্ডলে তারা-সনাথ চন্দ্রদেব মজলিসি দরবার বসান।

জল বায়ু।

এইবার দার্জ্জিলিঙের জল বায়ুর কথা বলিব। যে সকল শিশু রোগে জীর্ণ ও অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে, দার্জ্জিলিংয়ের জল বায়ুতে তাহাদের অত্যন্ত উপকার হয়। অল্প দিনের মধ্যেই তাহারা হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া পিতামাতার আনন্দ বর্দ্ধন করে। বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও দার্জ্জিলিংয়ে আসিয়া নষ্ট স্বাস্থ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পর্ব্বতের "কঠিন শক্ত ঠাঁই" তথায় ম্যালেরিয়া সুন্দরী ঘেঁসিতে পারেন না।

আর্দ্র ভূমিতে বাস করিলে যে সকল রোগ জন্মিতে পারে, দার্জ্জিলিংয়ে সে সকল রোগের ভয় নাই। তবে খুব শীতের সময় একটু আধটু সর্দ্দী কাসি হয় বটে, কিন্তু সে সর্দ্দী প্রায়ই বুকে বসে না বা ফুস্ ফুস্ বিকৃত করে না।

যাঁহারা জ্বর জ্বালায় ভুগিয়া ভুগিয়া অস্থি-চর্ম্ম সার হইয়াছেন, তাঁহারা অন্ততঃ দুই মাস কাল দার্জ্জিলিংয়ে বাস করিলে, জল বায়ুর গুণে নিশ্চয়ই নবজীবন লাভ করিবেন।

যাঁহারা অসুস্থ শরীর লইয়া দার্জ্জিলিংয়ে যাইবেন,—সে সময়টা যদি শীতকাল হয়,—তবে তাঁহারা পথিমধ্যে 'খরসান' নামক স্থানে কিছুদিন থাকিবেন। একেবারে ৭ হাজার ফিট উচ্চ দার্জ্জিলিংয়ে যাইবেন না।

দার্জ্জিলিংয়ে গেলে, ত্বকে অধিক পরিমাণে শোণিত সঞ্চালিত হয়। তাহাতে ত্বক পরিপুষ্ট হইয়া উঠে, শরীরেও বলাধান হইয়া থাকে। এইজন্য—এই হিমজাড্য দেশের অতিরিক্ত শৈত্য সেবনেও দেহের কোনও অপকার হয় না। আমাদের দেশে তাপাধিক্যের জন্য ত্বক স্বভাবতঃ শিথিল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, ফলে এদেশে সামান্য ঠাণ্ডা লাগিলেই সর্দ্দী হয়। কিন্তু শীত-প্রধান দার্জ্জিলিংয়ে ত্বকের তেজ ও স্থিতিস্থাপকতা শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে—সুতরাং শৈত্য সেবনে অপকার না হইয়া উপকারই হইয়া থাকে। আবার পর্ব্বতারোহণ কালে হৃদ্‌পিণ্ডের শোণিতস্রোত দ্রুতবেগে বহিতে থাকে। কি সুস্থ, কি অসুস্থ, দার্জ্জিলিংয়ে গেলে সকলেরই জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। সে ক্ষুধা কাহারও আগাগোড়া সমান থাকে, কাহারও বা দিন কতক পরে কমিয়া যায়। পরিপাক শক্তি ও ক্ষুধা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরের বল ও মাংস বৃদ্ধি হয়, পেশী সমূহ এতদূর দৃঢ় হয় যে, গুরুতর পরিশ্রম করিয়াও লোকে ক্লান্তি বোধ করে না।

এদেশে নিদ্রা দেবীর সঙ্গে যাঁহার প্রণয় নাই, দার্জ্জিলিংয়ে গেলে নিদ্রা তাঁহার সহচরী হইয়া দাঁড়ান। আমাদের দেশে বায়ুর উত্তাপে ও মানসিক উদ্বেগে প্রায়ই নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। দার্জ্জিলিংয়ের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মনে বিপুল আনন্দ জন্মে, এবং শৈত্য সেবনে মস্তিষ্কও শীতল হয়, এই উভয় কারণে দার্জ্জিলিংয়ে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা মূর্ত্তিমতী হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু এমন নিদ্রাকর স্থানে আসিয়াও দু'এক জনকে নিদ্রার জন্য আক্ষেপ করিতে শুনা যায়। দার্জ্জিলিংয়ে পৌঁছিবামাত্র—১০।১৫ দিন কাহারও কাহারও ভাল ঘুম হয় না, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই এ কষ্ট ঘুচিয়া যায়।

কোন্ ব্যক্তির দার্জ্জিলিং যাওয়া উচিত নহে।

যে সকল ব্যক্তি বা রোগী জল-বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য দার্জ্জিলিংয়ে যাইবেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন।

১। সমতলের বায়ু অবসাদক, পাহাড়ের বায়ু উত্তেজক। সুতরাং চেঞ্জে যাইবার পূর্ব্বে, সুযোগ্য চিকিৎসকের দ্বারা শারীরিক বল পরীক্ষা করান উচিত। যে রোগী অত্যন্ত দুর্ব্বল, দেহ কঙ্কাল-সার, তাহাকে কখনও দার্জ্জিলিংয়ে পাঠাইবেন না, পাঠাইলে উপকার ত হইবেই না, বরং এমন অপকারের সম্ভাবনা যে, দেশে ফিরিয়া আসিলে হয়ত তাহার মৃত্যুও ঘটিতে পারে। পর্ব্বতবাসে যে উত্তেজনা জন্মে, রোগীর তাহা সহ্য করিবার শক্তি থাকা চাই।

আমবাত রোগের পর, বসন্ত রোগের পর, কোন কারণে হৃদ্‌পিণ্ডের আকারগত

দোষ জন্মিলে, দার্জ্জিলিং অথবা কোন পার্ব্বত্য প্রদেশে যাওয়া উচিত নহে।

বৃদ্ধাবস্থায়, পুরাতন গ্রহণী বা আমাশয়াদি উদরাময়ে, যকৃৎ প্লীহার অতি বৃদ্ধিতে পুরাতন কাসে, ফুস্ ফুসের যান্ত্রিক বিকারে, দার্জ্জিলিং যাওয়া নিষিদ্ধ।

কাহার পক্ষে দার্জ্জিলিং যাওয়া উচিত ?

সমতল ক্ষেত্রে বাস করিয়া, অধিক পরিশ্রম বা জনতা-বহুল সহরে থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্য ঘটিলে, দার্জ্জিলিং যাওয়া কর্ত্তব্য।

দীর্ঘকালব্যাপী রোগ ভোগের পর শরীর দুর্ব্বল হইলে, 'ম্যালেরিয়া' বিষে রক্ত দূষিত হইলে, শিশুদিগের শরীর পোষণের যে কোন কারণে ব্যাঘাত ঘটিলে, দার্জ্জিলিং যাওয়া কর্ত্তব্য।

অধিক শ্লেষ্মাস্রাব যুক্ত কাস রোগে, ক্ষয় রোগের প্রথমাবস্থায়—পর্ব্বত বাসের মত ঔষধ ও পথ্য আর নাই।

বহুমূত্র রোগে পর্ব্বতবাস বড়ই উপকারী। কিন্তু শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে, পর্ব্বতবাস অনুচিত। অন্ততঃ রোগীর দেহে ভ্রমণ করিবার সামর্থ্য থাকা চাই। পর্ব্বতারোহণে ৫।৭ দিনের জন্য প্রস্রাব বাড়িতে পারে, কিন্তু তাহাতে ভয় নাই, ইহা স্বাভাবিক।

ম্যালেরিয়া রোগী দার্জ্জিলিংয়ে গেলে, প্রথম প্রথম তাহার ২।৪ বার জ্বর হইতে পারে, সে জন্য ভয় পাইয়া চলিয়া আসিলে চলিবে না। কিছুদিন বাস করিলেই দার্জ্জিলিং বাস স্বর্গবাসে পরিণত হইবে।

শ্বাস রোগে—দার্জ্জিলিং গেলে কাহারও রোগ বাড়ে, কাহারও কমে।

স্থূলকায় ব্যক্তি পাহাড়ে উঠিলে তাহার হৃদ্রোগ হইতে পারে, কিন্তু কিছু দিন পরেই তাহা সারিয়া যায়।

দার্জ্জিলিংয়ে এক প্রকার উদরাময় হইয়া থাকে। ইহার কারণ—সেখানকার জলে এক রকম খনিজ পদার্থ মিশ্রিত থাকিতে দেখা যায়, সেই জল পান করিলে উদরাময় হয়। দার্জ্জিলিং যাত্রীর প্রথমে এই উদরাময় জন্মিতে পারে। কিন্তু পাষ্টারকৃত ফিল্টারের জল ব্যবহার করিলে, উদরাময় সারিয়া যায়। বেলা ৫ টার পর কোন তরল দ্রব্য পান না করিলেও উদরাময় নিবৃত্ত হয়।

দার্জ্জিলিং গিয়া খুব বেড়াইতে হয়। নহিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় না। তবে ক্ষমতায় অতিরিক্ত পরিশ্রম করা কি বেড়ানো-উচিত নহে।

সারাঘাট হইতে শিলিগুড়ি পর্য্যন্ত যাইবার সময়—প্রায়ই যাত্রীর নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে। নিদ্রা যাইবার সময় গাত্র অনাবৃত রাখা অনুচিত। তাহাতে শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। তিন্ ধরিয়া ষ্টেশন হইতেই ভাল রকম শীত বস্ত্র ব্যবহার করা উচিত। খুব বলবান ও নীরোগ ব্যক্তিও যেন সোনাদহ ষ্টেশনের পর শীতবস্ত্র ব্যবহার করেন। কোনও রকমে ঠাণ্ডা না লাগে,—এ কথাটী সকলেই স্মরণ রাখিবেন।

দার্জ্জিলিংয়ে বেড়াইবার সময় যেরূপ বস্ত্রাদি ব্যবহার করিবেন, মুক্ত স্থানে বসিয়া থাকিবার সময়, তাহার চেয়ে মোটা কাপড় ব্যবহার করিতে হইবে।

দার্জ্জিলিংয়ে উপস্থিত হইয়াই, ঈষদুষ্ণ জলে বেশ করিয়া স্নান করিবেন, ইহাতে শরীর সুস্থ ও মন প্রফুল্ল হয়।

ডাক্তার শ্রীনগেন্দ্রকুমার দে।
(ক্যাম্বেলের ভূতপূর্ব্ব হাউস্ সার্জ্জন)

ব্রহ্মচর্য্য ও বিবাহ।

প্রবন্ধ লিখিবার সেই বিগত সুখ শান্তির স্মৃতি হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলে। যাহা গিয়াছে, আর কি তাহা ফিরিয়া আসিবে না?

মনে পড়ে প্রাচীন ভারতের কথা, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা, নিবৃত্তি পথ-গত প্রাচীন ভারতবাসীর কথা, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের কথা, আর দেশব্যাপী সুখ শান্তির কথা। তখন ধর্ম্ম-নিষ্ঠ সর্ব্বত্যাগী ঋষিগণ সমাজের নিয়ামক ছিলেন, তাঁহাদের উপদেশ মস্তকে ধারণ করিয়া রাজা দেশ রক্ষা করিতেন, চতুর্ব্বর্ণ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। তখন-রোগ-শোক অকাল মৃত্যুর প্রাদুর্ভাব ছিল না, নিত্য অভাব অনটনে লোকে উৎ-পীড়িত হইত না, প্রবৃত্তি-রাক্ষসীর মোহিনী রূপে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহ ও পরলোকে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইত না।

মাতৃক্রোড়ে শিশু যেমন স্বচ্ছন্দে থাকে, নিবৃত্তি জননীর ক্রোড়ে থাকিয়া প্রাচীন ভারতবাসীও সেইরূপ স্বচ্ছন্দে জীবন অতি-বাহিত করিত।

প্রাচীন বিজ্ঞান নিবৃত্তিমার্গানুসারী ছিল, নবীন বিজ্ঞান প্রবৃত্তিমার্গানুসারী। এক্ষণে দেখা যাউক—কোন পথ শ্রেষ্ঠ, নিবৃত্তিমার্গ না প্রবৃত্তি মার্গ?

যাবতীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের জনক স্বরূপ মহর্ষি মনু বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কাম্যাণা মুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।
যশ্চৈতান্ প্রাপ্নুয়াৎ সর্ব্বান্ যশ্চৈতান্ কেবলং ত্যজেৎ।
প্রাপণাৎ সর্ব্ব কামানাংতেভ্য এব বিশিষ্যতে॥

অনুবাদ—কাম্য দ্রব্যের উপভোগে কামনার শান্তি হয় না। পরন্তু অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে তাহা যেমন প্রবলতর হইয়া উঠে, কাম্য দ্রব্য পাইলে কামনাও সেইরূপ অধিকতর প্রকাশ হয়। যে ব্যক্তি কাম্য দ্রব্য সকল প্রাপ্ত হয়, তাহা অপেক্ষা যে ব্যক্তি কাম্য দ্রব্য সকল ত্যাগ করে সেই শ্রেষ্ঠ।

অপিচ—

ন মাংস ভক্ষণে দোষো ন মদ্যে নচ মৈথুনে।
প্রবৃত্তি রেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলঃ॥

অনুবাদ—মাংস ভক্ষণ, মদ্য পান এবং মৈথুনে কোন দোষ নাই। পরন্তু ভূত (মানব) গণের প্রবৃত্তি এইরূপ (মাংসাদিতে অনুরক্ত)। কিন্তু নিবৃত্তি অর্থাৎ ঐ সকল পরিত্যাগ মহা ফলপ্রদ। সে ফল কি? ইহাও পরলোকে শ্রেয়োলাভ।

ইহাই প্রাচীন ভারতের মূল মন্ত্র ছিল। আর সেই মন্ত্র বলেই প্রাচীন ভারতবাসী সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন অতিবাহিত করিত। হায়! কুক্ষণে আমরা সে মন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছি।

নিবৃত্তি ভোগ বিলাস চায় না, পরিণাম ভয়াবহ বলিয়া ভোগবিলাসকে দূরে রাখিতে চায়। সেইজন্য পূর্ব্বতন মনস্বিগণ এক্ষণ-কার ন্যায় বিবিধ ভোগ-বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি করেন নাই। কিন্তু এক্ষণে অল্প বুদ্ধি মানব-গণ আপাতমধুর প্রবৃত্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া বিবিধ বিলাসের দ্রব্য সৃষ্টি করিতেছে, যাহাতে জগৎ হাহাকারে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

আধুনিক বিজ্ঞান এক্ষণে যে সকল বিস্ময়কর এবং মনোরম পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছে ও করিতেছে, সে সকলের নিন্দা বাদ করিতেছি বলিয়া অনেকে প্রতিবাদ করিতে পারেন, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত দ্রব্য সকল কি পরিমাণে জগতের হিত বা অহিত সাধন করিতেছে—প্রথমে তাহা দেখা কর্ত্তব্য।

মানুষ চায় কি? মানুষ চায়—সুখ ও শান্তি। এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মত দ্বৈধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। আধুনিক বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত পদার্থ সকল জগতের সুখ ও শান্তি কিছু বর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছে কি? জরা ও মৃত্যুর প্রভাব কিছু রোধ করিতে পারিয়াছে কি? মানবের জঠর-জ্বালা নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিয়াছে কি?

কেহ বলিতে পারেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান দারুণ তৃষ্ণার সময় বরফ দেয়, দারুণ গ্রীষ্মে বৈদ্যুতিক পাখার সাহায্যে গ্রীষ্ম নিবারণ করে, আয়াস গম্য দূর দেশে বিনা আয়াসে সত্বর লইয়া যায়। তবে জগতের সুখ শান্তি কিছু বর্দ্ধিত করে নাই—ইহা কি করিয়া বলিব?

কিন্তু যিনি এরূপ বলেন তিনি ভ্রান্ত। সুখ দ্রব্য-সাপেক্ষ নহে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে :—

তস্মাৎ দুঃখাত্মকং দ্রব্যং নাস্তি কিঞ্চিৎ সুখাত্মকং।
মনসঃ পরিণামোঽয়ং সুখদুঃখোপলক্ষণঃ॥

সুখ দুঃখ দ্রব্য সাপেক্ষ নহে, উহা কেবল মনের পরিণতি মাত্র। একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

আমরা যে গৃহে যেরূপ শয্যায় শয়ন করি, একজন বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুক যদি সেই শয্যায় শয়ন করে তবে তাহার কতই সুখবোধ হয়। কিন্তু একজন প্রাসাদবাসী মহার্ঘ শয্যায় শয়নে অভ্যস্ত ধনবান যদি সেই শয্যায় শয়ন করে তবে তাহার কতই কষ্ট বোধ হয়। পদার্থ সেই এক শয্যা কিন্তু ব্যক্তি ভেদে সুখ ও দুঃখ অনুভূতি হইয়া থাকে। সুতরাং সুখ ও দুঃখ পদার্থে আছে এরূপ বলা যায় না। সুখ মনে, প্রাচীন যুগে ভারতবাসী নিবৃত্তিমার্গের অনুসরণ করিয়া অনায়াসে সেই মানসিক সুখের অধিকারী হইতেন।

আধুনিক প্রবৃত্তিমার্গানুসারী বিজ্ঞান দ্রব্য সংযোগে সুখোৎপাদনের যতই চেষ্টা করিতেছে, লক্ষেন্ধন অগ্নির ন্যায় ততই প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। বাষ্পীয় শকটের দ্রুত গমন এক্ষণে আর আমাদের সন্তুষ্ট করিতে পারে না, আমরা আরও দ্রুতগামী যান আকাঙ্ক্ষা করি। বৈদ্যুতিক পাখা সঞ্চালিত বায়ু, বরফ, লেমনেড প্রভৃতিতে আমরা অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। অভ্যস্ত দ্রব্য সুখকর হয় না, কিন্তু তাহার অভাব দুঃখপ্রদ। প্রবৃত্তি অনাবশ্যক অসংখ্য বিলাসিতার উপকরণ সৃষ্টি করিয়া মানব-জাতিকে তাহাতে এমন অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে যে, তাহাদের সংযোগে সুখ না হউক—অভাবে দুঃখ হইয়া থাকে। এইরূপে প্রবৃত্তি ক্রমশঃ বিলাসিতা ও তৎসহচর রোগ এবং অভাব, অনটন ও দুঃখের সৃষ্টি করিয়া মানব জাতির ঘোরতর অসুখ ও অশান্তি উৎপাদন করিয়াছে। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—

সর্ব্বং আত্মবশং সুখং সর্ব্বং পরবশং দুখম্।

এই মহাবাক্য বিস্মৃত হইয়াই আমরা দুঃখভোগ করিতেছি। ভ্রমণে, আহারে, শয়নে, বিলাসে মানব এক্ষণে নিতান্ত পরবশ। এই পরবশতা এক্ষণে কেবল ব্যক্তিগত নহে পরন্তু জাতিগত ও দেশগত হইয়া পড়িয়াছে।

মানব সমাজে শত অভাব অনটনের সৃষ্টি করিয়াই প্রবৃত্তি ক্ষান্ত হয় নাই। সুখ শান্তি বৃদ্ধির আশায়, রাজ্য রক্ষার আশায় কুহকিনী প্রবৃত্তি পাশ্চাত্য জাতিকে জল স্থল ও আকাশচারী অসংখ্য রণ সম্ভার নির্ম্মাণ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল। পাশ্চাত্য জাতি কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয়ে তাহা সুসম্পন্ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ তাহার ভীষণ পরিণাম দেখুন। হিতের চেষ্টায় তাহারা যাহা করিয়াছিল, আজ তাহা দ্বারা কি অহিতই না সঙ্ঘটিত হইতেছে। দেশের পর দেশ, গ্রামের পর গ্রাম ছারখার হইয়া যাইতেছে। কত ধর্ম্মমন্দির, পুস্তকাগার কল কারখানা ভূমিসাৎ হইতেছে। এই ভীষণ বিপ্লবে সমগ্র য়ুরোপ মহাদেশ বিধ্বস্ত এবং বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। ভবিষ্যতে আরও কি ঘটিবে তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু এই লোক-ক্ষয়কর মহান অনর্থের মূল কে? মূল প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তি মূলক অযথা রাজ্যলিপ্সা এবং অসংখ্য রণসম্ভার নির্ম্মাণের ইহা অবশ্যম্ভাবী ফল।

রাজা দুর্য্যোধনের প্রবৃত্তি মূলক অযথা রাজ্য লিপ্সার ফলে ভারতেও এইরূপ কুরুক্ষেত্রের লোক-ক্ষয়কর মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

প্রবৃত্তি মানুষকে স্বার্থপর করে, নিবৃত্তি স্বার্থত্যাগ করিতে শিখায়। প্রবৃত্তির দাস আমরা এতই স্বার্থপর হইয়া পড়িয়াছি যে, গৃহপার্শ্বে দরিদ্র ভিক্ষুককে এক মুষ্টি অন্নের জন্য লালায়িত দেখিয়াও অক্লেশে বিবিধ সুখাদ্য আহার করিতে পারি। প্রতিবাসীর ঘোরতর অর্থকষ্ট উপেক্ষা করিয়া অনায়াসে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিতে পারি। ইহার ফলে জগতে স্বল্প সংখ্যক মানব প্রচুর বিভবশালী হইয়া, বিলাসিতায় লক্ষ লক্ষ মুদ্রা অপব্যয় করিতেছে, আর অপর দিকে অধিক সংখ্যক মানব অশন-বসন আবাসের অভাবে দারুণ কষ্ট পাইতেছে।

প্রবৃত্তি মূলক বিলাসিতার সহিত মানব সমাজে বিস্তারও লাঘব ঘটিয়াছে। ব্যাস, বাল্মিকী, কালিদাস, বরাহমিহির, গ্যালিলিও, সক্রেটিস, হোমার, নিউটন, সেক্সপীয়র এখন আর জন্মগ্রহণ করেন না। আড়ম্বরহীন খাকের কলম আর ভূর্জ্জপত্রই বোধ হয় ভারতীর প্রিয়। তাই আজ ষোড়শ মুদ্রা মূল্যের ফাউণ্টেন পেন এবং চিত্র বিচিত্র কাগজ দেখিয়া তিনিও ক্রমশঃ অন্তর্হিতা হইয়াছেন।

বাহুল্য ভয়ে আমরা এ সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনা করিলামনা। ফলতঃ নিবৃত্তি মৃৎপাত্রে গঙ্গোদক, প্রবৃত্তি স্বর্ণপাত্রে কূপোদক, নিবৃত্তি হীন দীনবেশে সুখ ও শান্তি, প্রবৃত্তি মনোহর বেশে অসুখ ও অশান্তি। নিবৃত্তি পয়োকুম্ভ বিষমুখ, প্রবৃত্তি বিষকুম্ভ পয়োমুখ, নিবৃত্তি করুণাময়ী জননী; প্রবৃত্তি মনোহারিণী রাক্ষসী।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে মনুষ্য প্রবৃত্তির পথেই যাইতে চায়, কিন্তু নিবৃত্তি মহাফল প্রদ। তবে কি উপায়ে প্রাচীন ভারতবাসী প্রবৃত্তির কবল হইতে মুক্তিলাভ করিয়া

নিবৃত্তির সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন? কিরূপ শিক্ষার বলে ঋষিগণ ভারতবাসীকে প্রবৃত্তি মূলক বিলাসিতা হইতে দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন? কোন্ দীক্ষার বলে ভারতবাসী শত সহস্র অনাবশ্যক বিলাসিতার দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া দেশব্যাপী অভাব অনটনের সৃষ্টি করে? ইহার একমাত্র উত্তর ব্রহ্মচর্য্য।

খনিতে স্বর্ণ উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহা ভূষণ বলিয়া পরিগণিত হয় না। প্রথমে তাহাকে মল ভাগ হইতে বিযুক্ত করিতে হয়, পরে গলাইয়া আবশ্যক মত আকৃতি বিশিষ্ট করিতে হয়, তা'র পর তাহাতে কারুকার্য্য করিতে হয়। তবে সেই স্বর্ণ—অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়। স্বর্ণপ্রসূ ভারতের সেই সোনার মানুষ বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে এইরূপে পরিবর্ত্তিত ও গঠিত হইয়া মানব সমাজে শোভন অলঙ্কাররূপে শোভা পাইত।

বাল্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াই ভারতবাসীর মন ও চরিত্র গঠিত হইত। ইহাতে তাহাদিগের দেহ ক্লেশসহিষ্ণু, দৃঢ়, কর্ম্মঠ, রোগহীন ও অকাল-বার্দ্ধক্য-বর্জ্জিত হইত এবং পরমায়ু দীর্ঘ হইত। মন—নিবৃত্তি-প্রিয়, পরদুঃখ-কাতর, সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, কামক্রোধাদি রহিত, প্রশান্ত ও উদার হইত। ব্রহ্মচর্য্য ভারতের প্রাণ ছিল, ভারতের উন্নতির মূল ছিল, ভারতের সুখশান্তির হেতুভূত ছিল। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত চিত্তস্থির হয় না এবং চিত্তের স্থিরতা ব্যতীত ধী, ধৈর্য্য ও আত্মজ্ঞান সম্যকরূপে জন্মিতে পারেনা। ভারতের চির আদৃত সেই ব্রহ্মচর্য্য বিসর্জ্জন দিয়াই আমাদের এতদূর শারীরিক ও মানসিক অধঃপতন ঘটিয়াছে।

নিবৃত্তিমার্গাশ্রয় ব্যতীত জগতে সুখশান্তি লাভ করা যায়না, আর ব্রহ্মচর্য্য ভিন্ন নিবৃত্তি-মার্গের অনুসরণ করিবার উপযুক্ত মানসিক বল জন্মিতে পারেনা। সেই জন্য সুখ-শান্তি লাভ করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্য পালন নিতান্ত আবশ্যক।

এক্ষণে ব্রহ্মচর্য্য কিরূপে পালন করিতে হয় তাহাই বলিব।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ব্রহ্মচর্য্য একটী আশ্রম। আর্য্য শাস্ত্রমতে আশ্রম চারিটী, যথা—ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম এবং সন্ন্যাসাশ্রম। উপনয়নের পরে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন করার নাম ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম। ইহা দুই প্রকার যথা, উপকুর্ব্বাণ এবং নৈষ্টিক। দুই প্রকার ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের নিয়ম একই। প্রভেদ এই যে, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শেষে বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলে তাহাকে উপকুর্ব্বাণ বলে। আর যাবজ্জীবন গুরুগৃহে থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে তাহাকে নৈষ্টিক বলে।

কেবল ব্রাহ্মণগণই যে এই আশ্রমের অধিকারী তাহা নহে। ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যগণও ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, গার্হস্থাশ্রম এবং বাণপ্রস্থ আশ্রমের অধিকারী। কেবল সন্ন্যাসাশ্রমে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই অধিকার। কিন্তু মতান্তরে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যেরও সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার আছে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়। রঘুবংশে "স কিলা শ্রমমন্ত্যমাশ্রিত" অর্থাৎ তিনি (রঘু) অন্ত্য আশ্রম (সন্ন্যাস আশ্রম) করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিলেই যে ব্রহ্মচর্য্য পরিত্যাগ করিতে হইবে তাহা নহে। ভগবান মনু বলিয়াছেন—

বেদান অধীত্য বেদৌ বা বেদং বাপি যথাক্রমম্।
অবিপ্লুতব্রহ্মচর্য্যেব গৃহস্থাশ্রমমাবসেৎ॥

অনুবাদ—সমস্ত বেদ, দুই বেদ বা এক বেদ অধ্যয়ন করিয়া—ব্রহ্মচর্য্যের নিয়ম পালন করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে।

ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল নিয়ম পালন করিতে হয়, গৃহস্থাশ্রমে তাহা পালন করা চলে না। কারণ গৃহীর পক্ষে অপত্যোৎপাদন, জীবিকা অর্জ্জন প্রভৃতি করিতে হয়। তবে এস্থলে ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ কি? আয়ুর্ব্বেদেও কথিত হইয়াছে যে "ব্রহ্মচর্য্য মায়ুষ্যকরাণাং" অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য আয়ুষ্যকর পদার্থ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অপিচ শরীর ধারণের উপায় তিনটী, যথা আহার, নিদ্রা ও ব্রহ্মচর্য্য। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বসাধারণের জন্য। সুতরাং এখানেও ব্রহ্মচর্য্য অর্থে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে পালনীয় ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে না। তবে এ ব্রহ্মচর্য্য কি?

এক কথায় বলিতে গেলে এই ব্রহ্মচর্য্য-নিবৃত্তি মার্গের আশ্রয় গ্রহণ করা। হিন্দু বিধবারা যেরূপ সংযত ভাবে থাকেন, তাহাও এই ব্রহ্মচর্য্যের অন্তর্ভুক্ত। মদ্য, মাংস, মৈথুনপরিত্যাগ, ক্রোধ-লোভাদি পরিত্যাগ, সর্ব্বভূতে দয়া প্রভৃতি এই ব্রহ্মচর্য্যে পালন করিতে হয়। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে গৃহস্থাশ্রমে কিরূপ নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহা অবগত হইতে পারিবেন।

গৃহস্থের পক্ষে পুত্রোৎপাদন যখন কর্ত্তব্য, তখন মৈথুন-পরিত্যাগ করা কিরূপে সঙ্গত? পরিত্যাগ অর্থে এক্ষণে অতিরিক্ত সংযতভাব বুঝিতে হইবে। তাহা একতণ্ডুলন্যায়ে একটী তণ্ডুল আহার করিলে যেমন সে ব্যক্তি আহার করিয়াছে বলা যায় না, সেইরূপ পরিত্যাগের মধ্যে গণ্য। এ বিষয়ে নিবৃত্তি এতদূর প্রবলা হইয়া উঠিয়াছিল যে, শাস্ত্রকার নিম্নলিখিত আইন জারী করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথা:—

ঋতুমতীন্তু যো ভার্য্যাং সন্নিধৌ নোপসর্পতি।
অবাপ্নোতি স নন্দাত্মা ভ্রূণহত্যা মৃতাবৃতৌ॥

অনুবাদ—ভার্য্যার ঋতুকালে নিকটে থাকিয়াও যে ব্যক্তি ভার্য্যাতে উপগত হয় না, ঋতুকাল শেষ হইলে সে ব্যক্তি ভ্রূণ-হত্যার পাতক গ্রস্ত হয়।

পাঠকগণ অবগত আছেন যে, প্রবৃত্তি মূলক বিলাসিতার ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার অভাবে ফরাসী দেশের অনেকে বিবাহ করে না। এই জন্য পাছে লোক সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পায় বলিয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট অবিবাহিত ব্যক্তিগণের উপর করস্থাপন করিয়া তাহাদিগকে বিবাহিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। আর আমাদের নিবৃত্তির দেশে ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ জিতেন্দ্রিয় পুরুষগণ পাছে পত্নীতে উপগত না হইয়া পুত্রোৎপাদন করিতে না থাকে সেই ভয়ে এইরূপ ধর্ম্মমূলক আইন রাখিতে হইয়াছে। এইরূপ নিবৃত্তি সম্বন্ধে অনেক কথা পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অগস্ত্য, জরৎকারু প্রভৃতি মুনিগণ পুত্রোৎপাদনে পরাঙ্মুখ ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগের পিতৃপুরুষদিগকে গর্ত্তমধ্যে হেঁট-মুণ্ডে লম্বমান থাকিতে হইয়াছিল। সেই সকল পিতৃপুরুষকে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহারা বিবাহ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পত্নীর গর্ভাধান করিয়াই তাহার সঙ্গ বর্জ্জন করিয়াছিলেন।

এ সম্বন্ধে একটী নাতি প্রাচীন ঘটনার

উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভামতী নামক ভাষ্যকার বাচস্পতিমিশ্র বাল্যকালে—বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিবাহের পরে গুরুগৃহে বাস করেন এবং বিবাহ সম্বন্ধে কোন চিন্তাই তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। প্রৌঢ় বয়সে তিনি স্বগৃহে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার স্ত্রী স্বামি-ভবনে বাস করিতেন, গৃহ কার্য্য করিতেন, রন্ধন করিতেন, কিন্তু স্বইচ্ছায় স্বামীকে দর্শন দিতেন না। বাচস্পতি মিশ্র মনে করিতেন যে, তাঁহার শিষ্যেরাই রন্ধনাদি করিয়া থাকে। শিষ্যেরাও তাঁহাকে তাঁহার স্ত্রী সম্বন্ধে কোন কথা বলিত না। এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইল। ভামতী অন্তরাল হইতে স্বামীকে দেখিয়া এবং তাঁহার অধ্যাপনা শুনিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন। ঘটনাক্রমে একদিন সমস্ত ছাত্র অন্যত্র গিয়াছিল। বাচস্পতি স্বয়ং রন্ধন করিয়া আহার করিতে হইবে বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু যথা সময়ে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, অন্ন প্রস্তুত রহিয়াছে। তখন তিনি আপনার মনে বলিলেন,—এই অন্ন কেরন্ধন করিয়াছে না জানিলে আমি আহার করিতে পারিব না। তাঁহার স্ত্রী এই কথা শুনিয়া তাঁহার সমীপে আগমন পূর্ব্বক স্বামীকে প্রণাম করিলেন। বাচস্পতি জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে? ভামতী কহিলেন আপনার দাসী, পরিণীতা পত্নী। তখন বাচস্পতি বিস্মিত হইয়া কহিলেন, দেবি! আমি তোমাকে বিস্মৃত হইয়া বড়ই কুকার্য্য করিয়াছি। এক্ষণে তোমার কি প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিব বল। ভামতী আকার ইঙ্গিতে অপত্য কামনা করিলেন। বাচস্পতি বলিলেন, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, পুত্রোৎপাদনের কাল অতীত হইয়াছে। তবে লোকে খ্যাতির জন্য পুত্র কামনা করে। আমি তোমার নামে যে টীকা রচনা করিব—তাহাতে তোমার খ্যাতি তাহাতেই বহুদিন স্থায়ী হইবে। হায়! সেই নিবৃত্তির দেশে আজ প্রবৃত্তির কি ভীষণ তাণ্ডব নৃত্য!

যে বর্ণের যে প্রকার কর্ম্ম, সূত্র, দণ্ড, মেখলা ও বসন উপনয়নকালে ধারণ করিতে হয়, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে তাহাই পালন করিতে হয়। ব্রহ্মচারী গুরুর নিকটে বাস করিয়া স্বীয় তপস্যার বৃদ্ধির জন্য এই সকল নিয়মের অনুষ্ঠান করিবে। প্রতিদিন প্রাতে স্নান করিয়া, শুচি হইয়া, দেবতা, ঋষি ও পিতৃদিগের তর্পণ করিবে, দেবতাদিগের পূজা করিবে এবং সায়ং-প্রাতে সমিধের দ্বারা হোম করিবে। মধু, মাংস, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, ও মাল্য পরিত্যাগ করিবে, গুড়াদি আহার করিবে না, স্ত্রী সংসর্গ কবিবে না, শুক্ত (মধুর দ্রব্য ও জলসংযোগে প্রস্তুত অম্লরস যুক্ত তরল পদার্থ) সেবন করিবেনা এবং প্রাণী হিংসা করিবে না। শরীরে তৈল মর্দ্দন করিবে না, চক্ষুতে অঞ্জন (কাজল) পরিবেনা, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্র ব্যবহার করিবেনা, কাম (বিষয়াভিলাষ, ভোগেচ্ছা), ক্রোধ, লোভ, নৃত্য-গীত-বাদ্য পরিত্যাগ করিবে। দ্যূত (অক্ষক্রীড়াদি ব্যসন), লোকের সহিত অকারণ-কলহ, পরের দোষের বিষয় কথন, মিথ্যা বাক্য, কামভাবে স্ত্রীলোক দর্শন বা আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্টাচরণ হইতে বিরত থাকিবে। নিম্ন শয্যায় একাকী শয়ন করিবে, কদাচ ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রপাত করিবে না। কারণ ইচ্ছাপূর্ব্বক শুক্রপাত করিলে স্বকীয় ব্রত নষ্ট

হইয়া যায়। অকাম ব্রহ্মচারীর স্বপ্নে বা অনিচ্ছায় রেতঃপাত হইলে স্নান করিয়া সূর্য্যের অর্চ্চনা করিবে এবং "পুনর্ম্মাম্ এতু ইন্দ্রিয়ং" এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে। জল, কলস, পুষ্প, গোময় ও মৃত্তিকা যত প্রয়োজন হয় গুরুকে সংগ্রহ করিয়া দিবে, গুরুর অন্যান্য যে দ্রব্য প্রয়োজন হয় তাহাও সংগ্রহ করিয়া দিবে এবং নিত্য ভিক্ষা করিয়া অন্ন সংগ্রহ করিবে। যে সকল গৃহস্থ বেদবিহিত যজ্ঞাদি করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বদা আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এইরূপ গৃহস্থের নিকট হইতে ব্রহ্মচারী প্রতিদিন পবিত্রভাবে সিদ্ধান্ন ভিক্ষা করিবে। গুরুকুলে, জ্ঞাতিকুলে ও বন্ধুকুলে ভিক্ষা করিবে না। অন্য গৃহের অভাবে প্রথমে বন্ধুকুলে, তদভাবে জ্ঞাতিকুলে এবং তদভাবে গুরুকুলে ভিক্ষা করিবে। পূর্ব্ব কথিত গুণ-সম্পন্ন গৃহস্থ না পাইলে শুচি ও মৌনী হইয়া সমস্ত গ্রামে ভিক্ষা করিবে। কিন্তু মহাপাতকগ্রস্ত গৃহস্থকে পরিত্যাগ করিবে। ব্রহ্মচারী দূরস্থিত বৃক্ষ হইতে সমিধ আহরণ করিয়া কুটীরের চালে অথবা কোন আবৃত স্থানে রাখিবে এবং সেই সমিধ দ্বারা নিরলস ভাবে সায়ং-প্রাতে হোম করিবে। রোগশূন্য ব্রহ্মচারী ক্রমাগত সপ্তদিন ভিক্ষান্ন আহার এবং সমিধের দ্বারা হোম না করিলে তাহার ব্রত নষ্ট হয় ও তজ্জন্য অবকীর্ণি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ব্রহ্মচারী ভিক্ষান্ন একজনের নিকট না লইয়া বহু লোকের গৃহ হইতে সংগ্রহ করিবে। কারণ এইরূপ ভিক্ষাসমূহ দ্বারা ও সংগৃহীত ভিক্ষান্ন দ্বারা জীবন ধারণ করাকে মহর্ষিগণ উপবাসের তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ব্রহ্মচারী দেবতার উদ্দেশে অথবা পিতৃ উদ্দেশে শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তা-কর্ত্তৃক আহূত হইয়া যদি সেই একজনের নিকট হইতে মধুমাংসাদি বর্জ্জিত অন্ন আবশ্যকমত সংগ্রহ করেন, তাহা হইলে ব্রত লোপ হয় না। তবে কেবল ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচারীর পক্ষেই এই বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ব্রহ্মচারীর পক্ষে একজনের অন্ন ভোজন করা বিহিত নহে। গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অথবা আদিষ্ট না হইলেও স্বয়ং ইচ্ছা পূর্ব্বক নিত্য অধ্যয়নে এবং গুরুর হিত সাধনে যত্নবান হইবে। শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মন সংযত-করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া গুরুর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবে, গুরুর অনুমতি ব্যতীত উপবেশন করিবেনা। সদাচারসম্পন্ন শিষ্য উত্তরীয় দ্বারা শরীর আচ্ছাদিত করিয়া দক্ষিণ হস্ত বহিষ্কৃত রাখিবেন এবং গুরু "উপবেশন কর" বলিলে উপবেশন করিবেন। গুরুর নিকটে গুরু যেরূপ বস্ত্র পরিধান ও অন্ন আহার করেন, তাহা অপেক্ষা হীনবস্ত্র পরিধান ও হীন অন্ন আহার করিবে। রাত্রিশেষে গুরু শয্যা হইতে উঠিবার পূর্ব্বে—উঠিতে হইবে এবং রাত্রিতে গুরু শয়ন করিবার পরে শয়ন করিবে। শয়ন করিয়া, উপবেশন করিয়া, আহার করিতে করিতে অথবা গুরুর দিকে মুখ না রাখিয়া দণ্ডায়মান অবস্থায় গুরুর আজ্ঞা শ্রবণ বা গুরুকে সম্ভাষণ করিবেনা। গুরু আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য দণ্ডায়মান হইয়া, গুরু দণ্ডায়মান থাকিয়া আজ্ঞা করিলে, শিষ্য গুরুর দিকে কয়েকপদ গিয়া, গুরু আগমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে, শিষ্য তাঁহার অভিমুখে

যাইয়া, গুরু বেগে গমন করিতে করিতে আজ্ঞা করিলে, শিষ্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইয়া, গুরুর আদেশ গ্রহণ করিবে এবং তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিবে। গুরু অন্য দিকে মুখ রাখিয়া আদেশ করিলে, শিষ্য তাঁহার সম্মুখে গিয়া, গুরু দূরে থাকিয়া আদেশ করিলে, শিষ্য প্রণত হইয়া, গুরু নিকটে থাকিয়া আদেশ করিলে শিষ্য অবনতভাবে আজ্ঞা শ্রবণ করিবে এবং সম্ভাষণ করিবে। গুরুর নিকটে তাঁহার আসন ও শয্যা অপেক্ষা নিম্নস্তর আসন গ্রহণ করিবে। গুরুর দৃষ্টির সম্মুখে কখন হস্তপদ বিস্তার করিয়া যথেষ্ট ভাবে অবস্থান করিবেনা। শিষ্য অন্যের নিকটেও গুরুর নামের পূর্ব্বে—আচার্য্য বা উপাধ্যায় না বলিয়া কেবল গুরুর নাম উচ্চারণ করিবে না এবং গুরুর গতি, হাস্য বা চেষ্টার অনুকরণ করিবেনা। যেখানে গুরুর পরীবাদ (বিদ্যমান দোষের বর্ণন) অথবা নিন্দা (অবিদ্যমান দোষের কথন) হয়, শিষ্য সেই স্থান হইতে চলিয়া যাইবে বা হস্ত দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিবে। শিষ্য গুরুর পরীবাদ করিলে গর্দ্দভযোনি, নিন্দা করিলে কুক্কুরযোনি, অযথারূপে গুরুধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিলে কৃমি যোনি এবং গুরুর প্রশংসা সহ্য করিতে না পারিলে কীট যোনি প্রাপ্ত হয়। শিষ্য স্বয়ং গমনে অশক্ত না হইলে অন্যের হস্তে মাল্য-চন্দনাদি পাঠাইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবেনা, ক্রুদ্ধ হইয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে না, গুরু স্ত্রীলোকের নিকট—থাকিলে গুরুর অর্চ্চনা করিবে না এবং শিষ্য যান বা আসনে উপবিষ্ট থাকিলে তথা হইতে অবতরণ করিয়া গুরুর অর্চ্চনা করিবে। যে ভাবে উপবেশন করিলে বায়ু গুরুর দিকে যায় তাহাকে প্রতিবাত এবং যে ভাবে উপবেশন করিলে বায়ু শিষ্যের দিক হইতে গুরুর দিকে যায় তাহাকে অনুবাত বলে। এইরূপ প্রতিবাত বা অনুবাত ভাবে গুরুর সহিত উপবেশন করিবে না। শিষ্য গোযান অশ্বযান, বা উষ্ট্রযানে, প্রাসাদের উপরে, দীর্ঘ আসনে, তৃণ নির্ম্মিত আসনে, শিলা-তলে, কাষ্ঠময় দীর্ঘ আসনে এবং নৌকায় গুরুর সহিত উপবেশন করিতে পারে। গুরুর গুরুর নিকটে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। গুরুর গৃহে অবস্থান কালে পিতা, পিতৃব্য প্রভৃতি গুরুজনকে গুরুর অনুমতি ব্যতিরেকে অভিবাদন করিবে না। উপাধ্যায়াদি বিদ্যাদাতা গুরু দিগকে, পিতৃব্যদিগকে অধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে নিষেধকারককে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানে উপদেশদাতাকে গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিবে। বিদ্যা ও তপঃসম্পন্ন ব্যক্তিকে, শিষ্য ভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ স্ববর্ণ ব্যক্তিকে, গুরু-পুত্রকে এবং গুরুর পিতৃব্যাদি জ্ঞাতিকে গুরুর ন্যায় সম্মান করিবে। কনিষ্ঠই হউন, সমান বয়স্কই হউন বা জ্যেষ্ঠই হউন, গুরু-পুত্র বেদজ্ঞ হইলে, যজ্ঞ ক্রিয়ায় অধিকারী; কিন্তু গুরুপুত্র যজ্ঞ কার্য্যে নিযুক্ত হউন বা না হউন গুরুর ন্যায় সম্মানিত হইবেন। গুরুপুত্রের গাত্রে বিলেপন প্রদান, স্নান করান, গুরুপুত্রের উচ্ছিষ্ট ভোজন বা পদ প্রক্ষালন করিবে না। গুরুর সবর্ণা স্ত্রী গুরুর ন্যায় পূজনীয়া কিন্তু অসবর্ণা স্ত্রী কেবল প্রত্যুত্থান এবং অভিবাদন দ্বারা পূজনীয়া। গুরুপত্নীর গাত্রে তৈলাদি মর্দ্দন করিবে না, তাঁহাকে স্নান করাইবে না, গাত্রে সুগন্ধ লেপন করিবে না এবং তাঁহার কেশ সংস্কার

করিয়া দিবে না, বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবক-শিষ্য যুবতী-গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন না করিয়া কেবল ভূমিতেই অভিবাদন করিবে। কিন্তু বালক-শিষ্য যুবতী-গুরুপত্নীর পদ গ্রহণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিতে পারে। স্ত্রীলোকেরা স্বভাবতঃই মনুষ্যদিগকে দূষিত করিয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রীলোক সম্বন্ধে পণ্ডিত ব্যক্তির বিশেষ সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। অবিদ্বান ব্যক্তি বা বিদ্বান ব্যক্তি (আমি জিতেন্দ্রিয় মনে করিয়া) কেহই স্ত্রীলোকের নিকট অবস্থান করিবে না। কারণ দেহধর্ম্মবশতঃ কাম, ক্রোধযুক্ত পুরুষকে রমণীরা অনায়াসেই বিপথগামী করিতে পারে। মাতা, ভগিনী বা কন্যার সহিতও নির্জ্জন গৃহে বাস করিবে না। কারণ বলবান ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান ব্যক্তিকেও কুপথগামী করিতে পারে। যুবা শিষ্য যুবতী গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ না করিয়া "আমি অমুক" এই বলিয়া ভূমিতে যথাবিধি অভিবাদন করিবে। যুবা-শিষ্য বিদেশ হইতে সমাগত হইলে শিষ্টাচার স্মরণ করিয়া প্রথম দিন বয়োধিকা গুরুপত্নীর বামহস্তে বামপদ এবং দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ গ্রহণ করিবে। কিন্তু তাহার পর প্রতিদিন ভূমিতে অভিবাদন করিবে।

(আগামী বারে সমাপ্য)

ঘৃত।

—:o:—

ঘৃত ভারতবাসীর প্রধান খাদ্য। পণ্ডিতেরা ঘৃতহীন ভোজনকে উপযুক্ত ভোজন বলিয়া স্বীকার করেন না। অনেকস্থলে ঘৃতহীন-ভোজনকে বারিহীন নদী প্রভৃতি অনুপযোগী পদার্থের সহিত তুলনা করিয়াছেন। ঘৃত শ্রেষ্ঠ পুষ্টিকর ও বলবর্দ্ধক খাদ্য। অধিক পরিমাণে খাইলে মেদো বৃদ্ধি হয়।

সাধারণতঃ দুই প্রকার ঘৃতের প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মাহিষ ঘৃত ও গব্য ঘৃত। মাহিষ ঘৃত, গব্য ঘৃত অপেক্ষা অধিকতর শুভ্র, এবং ইহাতে দ্রবনীয় এসিড্ অপেক্ষাকৃত অধিক, অর্থাৎ ৫ গ্র্যাম মাহিষ ঘৃতে সাধারণতঃ ৩৪ কিউবিক সেণ্টিমিটর এসিড্ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পরিমাণ গব্য ঘৃতে এসিডের পরিমাণ ৩২ কিউবিক সেণ্টিমিটার মাত্র। গব্য ঘৃত অতি সদ্গন্ধযুক্ত।

ঘৃত নানা প্রকারে ব্যবহার করা হয়। লুচি, কচুরি, গজা, মিঠাই প্রভৃতি খাবার প্রস্তুতের জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। ডাল, তরকারি প্রভৃতি রন্ধনের জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। রুটিতে ঘৃত মাখান হয়। ভাতের সহিত ঘি ব্যবহার হয়। হোম, যাগ প্রভৃতি দেবার্চ্চন ক্রিয়ার জন্য ঘৃত ব্যবহার হয়। দেবার্চ্চন ক্রিয়ার জন্য কেবল বিশুদ্ধ গব্যঘৃত ব্যবহার হয়। অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার জন্যও ঘৃত ব্যবহার হয়। পুরাতন গব্য ঘৃত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় ঔষধ রূপে ব্যবহৃত হয়। দশবর্ষাধিকস্থিত ঘৃতকে

পুরাণ ঘৃত বলে। ঔষধার্থে ঘৃত যত অধিক পুরাতন হয়, ততই উহার গুণাধিক্য হয়।

অধুনা ঘৃত প্রস্তুতকরণের জন্য দুই প্রকার উপায় অবলম্বন করা হয়। প্রথম দধি হইতে, দ্বিতীয় কাঁচা দুধ হইতে। সাধারণতঃ দধিতে জলমিশ্রিত করিয়া মন্থন করিলে মাখন বাহির হইয়া উপরে ভাসিতে থাকে। পরে ঐ মাখন তুলিয়া লইয়া একটী পাত্রে সংগ্রহ করিতে হয়। এইরূপে সংগৃহীত মাখন লৌহ-কটাহে করিয়া অগ্নিতে পাক করিতে হয়। মাখন তুলিয়া লইয়া যে তরল অংশ অবশিষ্ট থাকে তাহাকে তক্র বা ঘোল বলে। প্রথমতঃ অগ্নির তাপে মাখন গলিয়া গিয়া ছানার অংশ ও জল কটাহের তলদেশে পতিত হয়। পরে ক্রমশঃ অধিক তাপযোগে জল বাষ্পাকারে পরিণত হয় এবং ছানার অংশগুলি খাঁক্‌রিরূপে পরিণত হয়। পরে ঘৃত ছাঁকিয়া লইয়া খাঁক্‌রি ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে পাকা ঘি বলে। কাঁচা ঘৃতের জল বাষ্পাকারে পরিণত করা হয় না এবং ঘৃতেও প্রখর তাপ প্রয়োগ করা হয় না। পাকা ঘি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। ইহা যে কেবল খাবার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয় তাহা নহে, অন্ন বা অন্যান্য খাদ্যে মাখিয়াও খাওয়া হয়।

কাঁচা ঘি খাবার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহার হয়। যদি কাঁচা ঘি ক্রয় করা হয় ও উহা ভোজনকালে ভাতে বা রুটিতে মাখিয়া খাইবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে উহা লৌহ পাত্রে উত্তপ্ত করিয়া লইলে পাকা হয়।

ঘৃত প্রস্তুত করণের দ্বিতীয় উপায়ে দধি না করিয়া কাঁচা দুধ হইতে মন্থন করিয়া মাখন উঠাইয়া ঐ মাখনের ঘৃত প্রস্তুত হয়। গোয়ালারা সাধারণতঃ এই উপায় অবলম্বন করে। তাহারা কাঁচা দুধ মন্থন করিয়া কিয়ৎপরিমাণ মাখন তুলিয়া লইয়া অবশিষ্ট অংশ দুধ বলিয়া বিক্রয় করে। মাহিষ দুগ্ধে ঘৃত অধিক, সেইজন্য মাহিষ ঘৃত সাধারণতঃ এইরূপে প্রস্তুত হয়। বাজারের অধিকাংশ দুগ্ধই মাখন তোলা দুধ।

বাজারে যে সুলভ মূল্যের ঘৃত বিক্রয় হয়, উহা সাধারণতঃ ভেজাল বা অন্য দ্রব্য মিশ্রিত। ঘৃতে সচরাচর মাটকলাই বা চীনাবাদামের তৈল, বসা, মৌয়া তৈলের ভেজাল দেওয়া হয়। মাট কলাইয়ের তৈলে এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়, মৌয়া তৈলের কিয়দংশ জমাট ও কিয়দংশ তরল, বসা ঠিক ঘৃতের মত, দেখিয়া প্রভেদ বুঝা যায় না, তবে আপেক্ষিক গুরুত্ব অধিক। এতদ্ব্যতীত নারিকেল, পোস্তদানা, তিল ও ভেরেণ্ডার তৈল ঘৃতে ভেজাল দেওয়া হয়। আজকাল ঘৃতের সহিত কেহ কেহ পেট্রোল মিশ্রিত করেন। ময়রারা প্রায় ভেজাল ঘৃতে খাবার প্রস্তুত করে। সেইজন্য দোকানের খাবার খাইয়া অম্ল ও অজীর্ণ রোগ উৎপন্ন হয়।

ঘৃত মেদো বর্দ্ধক, সুতরাং ক্ষয়রোগ নিবারক। অজা ঘৃত অর্থাৎ ছাগীদুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত ক্ষয়রোগে বিশেষ উপকারী।

ঘৃত স্বাস্থ্যের পক্ষে এতই উপকারী যে "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" কথার বহুকাল হইতে প্রচলন আছে। এ কথার উদ্দেশ্য এই যে, যতই কেন দুরবস্থা হউক না, তথাপি ঘি খাইতে বিরত থাকিবে না। ঘৃতের পুষ্টি-কারিতা এত অধিক যে, সামান্য পরিমাণ খাইলেই অধিক পরিমাণ শস্যাদি খাওয়ার

কায হয়। সেই কারণ চলিত কথায় বলে "পরে তসর খায় ঘি, তার আবার দুঃখ কি?" অর্থাৎ তসর দীর্ঘকাল স্থায়ী, সুতরাং তসর পরিলে কাপড়ের খরচের সাশ্রয় হয়, এবং ঘি অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুতরাং ঘৃতপায়ীদের অন্যান্য খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা কম হয়।

কিছুদিন হইল মাড়োয়ারী সম্প্রদায় বসা মিশ্রিত ঘৃত খাইয়া ধর্ম্মহানি হইয়াছে বিবেচনা করিয়া দলে দলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, এবং ঘৃত ও ঘৃতপক্ক মিষ্টান্নাদি ত্যাগ করিয়াছেন। উক্ত সম্প্রদায়স্থ ঘৃত-ব্যবসায়িগণ বসামিশ্রিত ঘৃত বেচিবেন না বলিয়া ধর্ম্মঘটও করিয়াছেন। কেবল বসামিশ্রিত ঘৃত বন্ধ করিলেই যে অবিশুদ্ধ ঘৃতের অপকারিতা দমন হইবে তাহা নহে। বসা নিরামিষ ভোজীদের অপবিত্র বটে এবং মৎস্যমাংস-ভোজী হিন্দুসমাজে আবার বিরুদ্ধ খাদ্য বটে কিন্তু স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তত দূষণীয় নহে। কারণ ঘৃত মেদের রূপান্তর মাত্র; সুতরাং বসা ও ঘৃত ধরিতে গেলে একই পদার্থ। তবে মৃত বা পীড়িত জন্তু বা সর্পাদির বসা অস্বাস্থ্যকর। যাহা হউক ধর্ম্মঘটের ফলে যদি দেশে পবিত্র ও বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রচলন হয়, তাহা হইলে হিন্দুসমাজ কেন—সমগ্র ভারতবাসীর মহদুপকার সাধিত হইবে। দেশের লোকের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিবারণ হইবে। পবিত্রতা দেখিলে চলিবে না, বিশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কারণ ঘৃতে এমন সব দ্রব্য মিশান যাইতে পারে যাহা অপবিত্র না হইলেও অস্বাস্থ্যকর।

কিন্তু একটী কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ঘৃতে চর্ব্বি মিশ্রণের কথা বালক কাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি, এবং আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই একথা জানেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মাড়োয়ারী ঘৃত-ব্যবসায়িগণ কি এ সম্বন্ধে এতদিন অনভিজ্ঞ ছিলেন? তাই আজ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিতেছেন? যাহা হউক ইহার ফলে যদি অবিশুদ্ধ ঘৃতের চলন বন্ধ হইয়া বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রচলন হয়, তাহা হইলে দেশবাসীর পক্ষে নিশ্চয়ই হিতকর বটে। কিন্তু যদি পবিত্রতার ভানে ঘৃতের মূল্যবৃদ্ধি হইয়া যায় ও অবিশুদ্ধতা রহিয়া যায়, তাহা হইলে পরিণাম বড়ই বিষময় হইবে। যাহাতে দেশে বিশুদ্ধ ঘৃত অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও পাওয়া যায়, তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত। গোহত্যা-নিবারণ করিতে পারিলে ইহার প্রতিকার হইতে পারে, কিন্তু তাহা দুঃসাধ্য; তবে যদি কৃষক, গোপালক, গোপ, গো-রক্ষক গণ সকলেই ধর্ম্মঘট করিয়া কসাইদের গো-বিক্রয় বন্ধ করেন তাহা হইলে কতকপরিমাণে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আর যদি সমগ্র ভারতবাসী খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি সকলেই গোমাংস ত্যাগ করেন, তাহা হইলে গোকুল বর্দ্ধিত হইয়া বিশুদ্ধ ঘৃতের অভাব নিশ্চয় মোচন হইতে পারে। যাহাহউক বিশুদ্ধ ঘৃতের প্রচলনের জন্য দেশবাসীর যে চেষ্টা চলিয়াছে তাহা স্থায়ী হউক। আমাদের চিররুগ্ন-বাঙ্গালী সন্তান বিশুদ্ধ ঘৃতের মর্য্যাদা বুঝিয়া চা সরবৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিয়ম পূর্ব্বক প্রতিদিন ঘৃত সেবনে অভ্যস্ত হউন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রবেত্তাগণ ঘৃতের গুণ বর্ণনে বলিয়া গিয়াছেন,—

ঘৃতং রসায়নং স্বাদু চক্ষুষ্যং বহ্নি দীপনম্
শীতবীর্য্যং বিষালক্ষ্মী পাপপিত্ত নিলাপহম্।
অল্পাভিষ্যন্দি কান্ত্যোজঃ তেজো লাবণ্যবৃদ্ধিকৃৎ
স্বর স্মৃতিকরং মেধামায়ুষ্যং বলকৃদ্ গুরু।

উদাবর্ত্ত জ্বরোন্মাদ শূলানাহ ব্রণান্ হরেৎ।
স্নিগ্ধং কফকরং রুক্ষং ক্ষয় বীসর্প রক্তনুৎ॥

অর্থাৎ ঘৃত রসায়ন, স্বাদু, চক্ষুষ্য, অগ্নি-দীপ্তিকারক, শীতল বীর্য্য, বিষঘ্ন, দারিদ্রনাশক, পাপধ্বংসী, পিত্তনাশক, বায়ু শান্তিকারক, অল্প অভিষ্যন্দী, লাবণ্যজনক, ওজোবর্দ্ধক, তেজস্কর, কান্তিকারক, বুদ্ধি উৎপাদক, স্বর বিশোধক, স্মরণশক্তি বর্দ্ধক, বায়ু বৃদ্ধিকর, বলকারক, গুরু, স্নিগ্ধ ও শ্লেষ্মাজনক। ঘৃত পান করিলে উদাবর্ত্ত, জ্বর, উন্মাদ, শূল, আনাহ, ব্রণ, উরক্ষত, বীসর্প ও রক্তদোষ উপশমিত হয়।

শাস্ত্রে কথিত স্বাস্থ্যের পক্ষে এরূপ উপকারী দ্রব্যের ব্যবহারে সকলেই অভ্যস্ত হউন—ইহাই আমাদিগের বক্তব্য।

ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাস।

হামজ্বরে কবিরাজ চিকিৎসা।

—:o:—

গত ফাল্গুন মাসে আমাদের বাড়ীতে একটী মেয়ের হাম হয়। মেয়েটীর বয়স চারি বৎসর। প্রথমে খুব জ্বর হয়। তিন চারি দিন প্রবল ১০২ ডিগ্রি হইতে ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত উঠিতে থাকে। সেই অবস্থায় তিনদিনের পর হাম দেখা দেয়, অনেকক্ষেত্রে প্রবল জ্বর ছাড়িয়া যাওয়ার পর হাম দেখা দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তাহা না হইয়া জ্বরের উপরই হাম দেখিতে পাওয়া গেল। যখনই হাম দেখা দিল, সেই সময় হইতে পেটের অসুখও আরম্ভ হইল। দিনে রাত্রিতে দশ বার, বার করিয়া মল হইত। মলের রং বিভিন্ন প্রকারের। কখনও সবুজ, কখন হলদে, কখনবা মিশ্রিত রঙের এবং সেই সঙ্গে আমও ছিল এবং ফেণা ফেণা মল হইত। এই ভাবে জ্বর ও পেটের অসুখের উপর হামও ভীষণ মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতে লাগিল। সমস্ত শরীর লেপিয়া হাম বাহির হইলেও জ্বর এবং পেটের অসুখ কিছুমাত্র কমিল না। বরং সেই সঙ্গে পিপাসা ও গায়ের জ্বালায় কন্যাটী খুব ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। এইরূপ ভাবে পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেলেও যখন রোগের কিছুমাত্র উপশম বুঝিতে পারা গেল না, তখন একজন ডাক্তার বন্ধুকে ডাকিলাম। তিনি আসিয়া বিশেষ করিয়া দেখিয়া-শুনিয়া ঔষধ দিয়া গেলেন। আমরাও তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া সে সময়কার মত নিশ্চিন্ত হইলাম।

বন্ধু ডাক্তারটী তিন চারিদিন চিকিৎসার পর একদিন বলিলেন,—বুকের দক্ষিণদিকে একটু সর্দ্দি বসিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সেজন্য একটু চিন্তার কারণও ইঙ্গিত করিয়া গেলেন। আমরা তো কন্যাটিকে লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িলাম। এবং অন্য প্রকার নূতন কিছু ব্যবস্থা না করিয়া পূর্ব্ববৎ ডাক্তারী চিকিৎসা চালাইতে লাগিলাম। তবে ভগবানের কৃপায় ইতিমধ্যে হামগুলি ক্রমশঃ মিশাইয়া যাইতে লাগিল। হামগুলি মিলাইতে লাগিল বটে, কিন্তু আবার এক আগন্তুক রোগ আসিয়া আমাদিগকে

হতাশ করিয়া দিল। ডাক্তার বাবু বলিলেন,—বুকের দুই দিকেই নিউমোনিয়া দেখা দিয়াছে। কন্যাটীকে লইয়া শুধু আমরা নয়, ডাক্তার বাবুও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তথাপি আমরা তাঁহারই হাতে রোগী রাখিয়া দিয়া ভগবানের করুণার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু যখন পাঁচ ছয় দিন কাটিয়া গেল, অথচ জ্বর, পেটের অসুখ, পিপাসা, ও নিউমোনিয়া কিছুই কমিল না, তখন আমাদের মনও বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল। একদিন বৈকালে কন্যাটী জ্বরের আধিক্যে খুব অভিভূত হইয়া পড়িলে, আমি কলিকাতার একজন বহুদর্শী কবিরাজ মহাশয়ের নিকটে গিয়া কন্যাটীর সমস্ত অবস্থা বলিলাম। তিনি শুনিয়া বলিলেন,—"কাল সকালে দেখিয়া ব্যবস্থা করিব।"

পরদিন কবিরাজ মহাশয় আসিয়া একটী পাচনের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। তখন ডাক্তার বাবুটীও ভাগ্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন,—তিনি বলিলেন;—আমাদের মতে কন্যাটীর বাঁচিবার আশা খুব কম। তদুত্তরে কবিরাজ মহাশয় আমাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন,—কোন ভয় নাই,—এই পাচনটী খাওয়াইতে থাক ইহাতেই সারিয়া যাইবে—অন্য কোন ঔষধ-পত্র দিতে হইবে না।

কবিরাজ মহাশয় যে পাচনটী বলিয়া দিলেন,—তাহা এই,—যোয়ান, বাবুইতুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজ, প্রত্যেকটী আধতোলা পরিমাণে লইয়া ছেঁচিয়া দুইসের জলে সিদ্ধ করিয়া একসের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া সেই জল একটু একটু করিয়া পিপাসার সময় অথবা অন্য সময় খাওয়াইতে হইবে। একসের জলে সমস্ত দিন ও রাত্রি চলিবে। সমস্ত না খাইতে পারিলেও ক্ষতি নাই। পথ্য দুধ-সাগু।

আমরা যথা নিয়মে উক্ত জিনিস কয়টী সিদ্ধ করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। প্রথম দিনে পিপাসার আধিক্যে সমস্ত পাচনটাই দিনে রাতে শেষ হইয়া গেল। পরদিন সকালে দেখা গেল, অন্যদিন অপেক্ষা জ্বর কম; রাত্রিতে মলের সংখ্যাও কম হইয়াছিল। এইরূপে একই পাচন আমরা পাঁচ ছয় দিন চালাইয়া গেলাম। দিনের পর দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে—জ্বর, পেটের অসুখ, নিউমোনিয়া, পিপাসা প্রভৃতি সবই কমিয়া গেল। ডাক্তারবাবুও অনুগ্রহ করিয়া প্রতিদিন আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তিনিও কবিরাজী চিকিৎসার—অত্যাশ্চর্য্য ফল দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেলেন।

তা'রপর আমাদের বাড়ীতে আবার দুইটী ছেলের হাম দেখা দিল। একটীর বয়স দুই বৎসর, অপরটীর বয়স এক বৎসর। এবার প্রথম হইতে উক্ত কবিরাজ মহাশয়কে সংবাদ দিলাম। তখনও হাম বাহির হয় নাই। কেবলমাত্র জ্বর দেখা দিয়াছে। তিনি জ্বর শুনিয়াই হাম হইবে স্থির করিয়া ব্যবস্থা বলিয়া দিলেন,—আধ তোলা আন্দাজ ব্রাহ্মী শাকের রস প্রত্যেক ছেলেটীকে খাওয়াইয়া দাও এবং পথ্য সাগু দাও। এইরূপে তিনদিন প্রাতে একবার করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস খাওয়াইলাম। হামও খুব বাহির হইয়া গেল। কন্যাটীর মত ছেলে দুইটীরও জ্বর, পেটের অসুখ ও অত্যন্ত পিপাসা ছিল। তার মধ্যে ছোটটীর বুকে একটু সর্দ্দি দেখা দিল

এবং চক্ষু দুইটীর মধ্যেও অত্যন্ত হাম দেখা দিল। এবারেও আমরা তিন দিন ব্রাহ্মী শাকের রস দেওয়ার পর কবিরাজ মহাশয়ের আদেশক্রমে পূর্ব্ববৎ,—যোয়ান, বাবুইতুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজের জল তৈয়ারী করিয়া খাওয়াইতে লাগিলাম। ভগবানের কৃপায় ছেলে দুইটীও ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিতে লাগিল।

ছোট ছেলেটীর চোকে যে হাম বাহির হইয়াছিল। সে জন্য তাহার বাম চক্ষুটী হাজিয়া যাওয়ার মত হইল এবং চোকের তারার মনিটার উপর একটা সাদা বিন্দুর মত দাগ দেখা যাইতে লাগিল। যদিও এই ছেলে দুইটীর চিকিৎসা কবিরাজী মতে চলিতেছিল, তথাপি ডাক্তার বন্ধুটী অনুগ্রহ করিয়া প্রত্যহ আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তিনি ছোট ছেলের চোকটী দেখিয়া ভয়ের কারণ বলিয়া গেলেন এবং একজন অভিজ্ঞ চক্ষু চিকিৎসককে ডাকিয়া দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন এবং যতক্ষণ না চোকের ডাক্তার আসেন ততক্ষণ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর "বোরিক্ এসিড" (ডাক্তারী ঔষধ, সোহাগা হইতে প্রস্তুত) গরম জলে গুলিয়া সেই জলে চোক ধুইয়া দিতে বলিলেন।

ইতিমধ্যে শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয়কেও একবার চোকের কথা জানাইলাম। তিনি যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ ছেঁচিয়া রস করিয়া সেই রস দিনে তিন চারিবার ফোঁটা ফোঁটা করিয়া চোকে দিতে বলিলেন। এদিকে অভিজ্ঞ চক্ষুচিকিৎসক ডাকিতে এবং তাঁহার আসিতেও দুইদিন বিলম্ব ঘটিয়া গেল। এই দুইদিন আমরা উক্ত যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ ছেঁচিয়া রস করিয়া দিতে লাগিলাম। দুইদিন পরে আমার বন্ধু ডাক্তারটী বলিলেন, চোকের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। যাহা হউক কবিরাজী ঔষধেই উপকার হইল বলিয়া আমরা আর ডাক্তারী ঔষধ না আনাইয়া ঐ কবিরাজী ব্যবস্থাই চালাইতে লাগিলাম। সপ্তম দিনে দেখা গেল,—চোকের আর কোন প্রকার দোষ নাই, সব সারিয়া গিয়াছে।

তা'রপর আমি বহুস্থলে উক্ত কবিরাজী পাচন প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল লাভ করিয়াছি। হাম হইবার সম্ভাবনা থাকিলে অথবা সামান্য পরিমাণে হাম দেখা দিলে প্রথম তিন দিন প্রাতে একবার করিয়া ব্রাহ্মীশাকের রস দিতে হয়। তাহাতে ভিতরকার সমস্ত হাম বাহির হইয়া পড়ে। বাহির না হইলেও আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। তা'রপর হামের অবস্থায় পেটের অসুখ, জ্বর, সর্দ্দি, কাসি প্রভৃতি যাহাইথাকুক না কেন,—সেই সময়ে যোয়ান, বাবুই তুলসী, মেথী ও সাদা পেঁয়াজ সিদ্ধ জল একটু একটু করিয়া সমস্ত দিন খাওয়াইয়া গেলে সব উপসর্গ ও হাম সারিয়া যাইবে এবং হাম অথবা বসন্ত চোকে বাহির হইলে, যষ্টিমধু ও গুলঞ্চ একটু জল দিয়া ছেঁচিয়া রস বাহির করিয়া চোকে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দিলে চক্ষুও নষ্ট হইবে না।

হাম একটী সাধারণ ব্যাধি। প্রতিবৎসরই উহা একবার করিয়া অনেক গৃহস্থের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে। সেই সময় আমার লিখিত মত ব্যবস্থা করিয়া সকলেই দেখিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে যে পাচনটীর কথা উল্লেখ করা গেল, উহা নির্দ্দোষ ভেষজ। উহা ব্যবহার করিয়া কোন প্রকার কুফল ফলিবে না। অধিকন্তু অল্প সময়ের মধ্যে রোগও সারিয়া যাইবে—ইহা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীরাখালদাস সেন গুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ বায়ু।

(তুলনা মূলক আলোচনা)

সে এক স্মরণাতীত যুগের স্বপ্নময়ী কাহিনী। ভারতের সুপবিত্র সাধনা-কুঞ্জ নৈমিষ-কাননে সমবেত ঋষিগণ জরাব্যাধিগ্রস্ত মানবের দুঃখ-কষ্ট মোচনকল্পে যে মহান তথ্য সমূহের আলোচনা করিয়াছিলেন—যে সনাতন চিকিৎসাতন্ত্রের প্রচারদ্বারা ভবিষ্য-বংশীয়দের জন্য অমূল্য রত্নপেটিকা সাদরে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই অবলম্বনে বহুশতাব্দীকাল ভারতের সিদ্ধ সাধকগণ অকাল মৃত্যুর কবল হইতে দেশ-বাসীদিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের ইহ-কালের ও সঙ্গে সঙ্গে পরকালেরও মঙ্গল বিধান করিয়া গিয়াছেন।

তা'রপর নানারূপ বিরুদ্ধভাবের তরঙ্গ-তাড়নায়, নানাপ্রকার সামাজিক আন্দোলন ও রাষ্ট্রীয়-বিপ্লব-প্লাবনে ভারতবর্ষ ওলট-পালট হইয়া গেল। অত্যাচারের নির্ম্মম পেষণে ক্লিষ্ট—তাচ্ছিল্যের হিমানী প্রবাহে জড়ীভূত ভারত, আপনার অতীত কীর্ত্তির গরিমাময় স্মৃতিটুকুমাত্র আঁকড়াইয়া ধরিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে পড়িয়া রহিল। সমগ্র ভারত-বর্ষ যখন এমনি অবসাদ ক্লিষ্ট হইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বাঙ্গালার ভাব-সাগরে একটা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল—একটা সুমধুর কলনাদে বাঙ্গালার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত হইয়া উঠিল—বাঙ্গালীর অন্তরে একটা প্রবল কর্ম্মস্পৃহা জাগ্রত হইল। তাহারই ফলে বাঙ্গালায় গীতি কবিতার সৃষ্টি হইল—নব্য ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা হইল—আয়ু-র্ব্বেদের বিরাট বিস্তৃতি আরব্ধ হইল।

যে স্পন্দন-প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া সেই যুগের বাঙ্গালী এমনি জাগ্রত হইয়া এই তিনটি বিষয়কে গৌরবের উচ্চতম সৌধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল—বাঙ্গালীর ভাগ্যদোষে সে স্পন্দন একেবারে থামিয়া গেল।

বাঙ্গালার সে দিন আর নাই! বাঙ্গালার গীতি কবিতা আর বাঙ্গালীর কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিয়া, প্রাণ আকুল করে না—নবদ্বীপের পুণ্য প্রাঙ্গনের প্রজ্জলিত জ্ঞান প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া নিবিয়া গিয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ বলিতেও কেবল চরক ও সুশ্রুতের কঙ্কাল, মাধবকর ও চক্রদত্ত, বিজয় রক্ষিত ও শ্রীকণ্ঠের প্রাণহীন দেহগুলি জড়াইয়া ধরিয়া দেশমাতৃকার সুসন্তান কতিপয় প্রবীণ চিকিৎসক হিন্দুর গৌরবের এতবড় একটা জিনিষ সাদরে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন।

আয়ুর্ব্বেদ যে কতবড় উচ্চাঙ্গের চিকিৎসা বিজ্ঞান, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সুধীবচন উদ্ধৃত করিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন হইতে পারে না। শত শত শতাব্দী ধরিয়া এত আবর্ত্তন, বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আজও যে ইহার স্বাতন্ত্র রক্ষা করিয়া সনাতন শাস্ত্ররূপে পুজিত হইতেছে—ইহাই তাহার শ্রেষ্ঠতার চরম নিদর্শন। কিন্তু মধ্যাহ্ন তপনের উজ্জ্বল আলোক যেমন সঞ্চারমান জলদজালে আবৃত হয়, তেমনি স্বীকার করিতেই হইবে যে, আয়ুর্ব্বেদের গৌরব-ভাতি আজ ম্লান হইয়া গিয়াছে।

দীর্ঘকালের এই চিকিৎসাতন্ত্রের কোন্ কোন্ অংশ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও পরি-

ত্যক্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা অতীব দুরূহ ব্যাপার,—তবে ইহা সুনিশ্চিত যে, আধুনিক গ্রন্থসমূহ ভ্রম-প্রমাদশূন্য নহে। মাঝে মাঝে এমন সব পরস্পর বিরোধী অসংলগ্ন প্রয়োগ লক্ষিত হয় যে, তাহাতে বর্ণিত বিষয়গুলি ত মীমাংসীত হয়ইনা—অধিকন্তু উহাদিগকে প্রহেলিকার মতই দুর্ব্বোধ করিয়া তোলে।

আধুনিক গ্রন্থসমূহে এইরূপ যে সকল ত্রুটি দেখা যায়, তাহার জন্য আয়ুর্ব্বেদ প্রচারকগণ দায়ী নহেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের প্রতি ইহার জন্য অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিলে আমাদিগকে নিরয়গামী হইতে হইবে। তাঁহারা রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া আজও আয়ুর্ব্বেদ বাঁচিয়া আছে—নতুবা ভারতের অন্যান্য বহু অমূল্য রত্নের ন্যায় ইহাও বহুদিন পূর্ব্বে লুপ্ত হইয়া যাইত।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত কোন জটীল বিষয় মীমাংসা করিবার চেষ্টার মত ধৃষ্টতা আমার নাই, তবে অধ্যয়নকালে যে সকল প্রশ্নের সদুত্তর না পাইয়া পাশ্চাত্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি, আয়ুর্ব্বেদের সিদ্ধসাধকগণ সমীপে তাহাই নিবেদন করিতেছি মাত্র। যদি কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক কৃপা পূর্ব্বক আমার ভ্রম প্রদর্শন করতঃ বিষয়গুলির যথানুরূপ ব্যাখ্যা করিবার কষ্টস্বীকার করেন, তাহা হইলে এই দীন লেখক এবং অন্যান্য বহু আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

শাস্ত্রকারদিগের মতে 'দোষধাতুমলমূলং হি শরীরম্'। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষার্থীর সর্ব্ব প্রথমেই দোষত্রয়ের সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। বাতাদি দোষত্রয়ের মধ্যে বায়ুই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান ও সর্ব্বকর্ম্ম নিয়ন্তা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; সুতরাং বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা বায়ুসম্বন্ধেই আলোচনা করিব

"বায়ুস্তন্ত্র যন্ত্রধরঃ প্রণোদানসমানব্যানাপানাত্মা, প্রবর্ত্তকশ্চেষ্টানাম……" প্রভৃতি চরক বর্ণিত বায়ুর কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করিলে পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ—ব্যাখ্যাত 'নার্ভের' ক্রিয়ার অনুরূপ বলিয়াই মনে হয়। আমাদের এই ধারণা যে নিতান্ত অমূলক নহে তাহাই দেখাইবার জন্য তুলনা-মূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। বলা আবশ্যক যে, পশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া আমরা আয়ুর্ব্বেদের মূল্য নিরূপন করিতে প্রবৃত্ত হই নাই। বিদেশীয় পণ্ডিত দিগের নব-লব্ধ-জ্ঞানালোকের সাহায্যে অধুনাতন কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন আর্য্যরত্নরাজি সন্ধানের প্রয়াস পাইয়াছি। প্রতীচ্যবুধমণ্ডলীর সাধনার ফল এত তুচ্ছ ও এত অকিঞ্চিৎকর নয় যে, আমরা তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিবনা। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে উন্নতিলাভ করিয়া প্রতীচির পণ্ডিতগণ যে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগের জ্ঞানসীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূরে অগ্রসর হইয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; তবে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, শরীর ও শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের গবেষণা গভীর ও ব্যাপক। যাহা হউক, ঋষিগণ শারীর বায়ুকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া তাহাদের যে সকল কার্য্য নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন এক্ষণে আমরা তাহার সহিত প্রতীচ্য মতের সামাঞ্জস্য দেখাইবার চেষ্টা করিব।

১। প্রাণবায়ু।—চরক প্রাণবায়ুর স্থান মস্তক, কর্ণ, জিহ্বা মুখ ও নাসিকা এবং তাহার কার্য্য "ষ্ঠীবনক্ষবথূদ্গার শ্বাসাহারাদি কর্ম্মচ" বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন মহাশয় প্রাণবায়ুকে অন্নজান বাহক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* পশ্চাত্য-পণ্ডিতগণ ষ্ঠীবন প্রভৃতি কার্য্য নিম্নলিখিত ভাবে সম্পন্ন হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

(ক) ষ্ঠীবন—Chorda Iympanii নামক মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ "নার্ভ"-কেন্দ্রের উত্তেজনা বশতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। কখনও কখনও ঘ্রানস্বাদের প্রতিক্রিয়াজনিত কার্য্যের (Reflex-action) দ্বারা সম্পাদিত হয়। যেমন দূষিত গন্ধ আঘ্রান করিলে অথবা বিরস দ্রব্য রসনাসংস্পর্শে আনয়ন করিলে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতে হয়।

(খ) ক্ষবথু—নাসারন্ধ্রের কলা সমূহ উত্তেজিত হইয়া Superior Laryngeal ও vagus ফুস্‌ফুসের বায়ু সশব্দে নির্গত করে। এই বায়ুর সহিত শ্লেষ্মাও নির্গত হয়।

(গ) উদ্গার—বমনের বাচক শব্দ। কণ্ঠনালীর উত্তেজনা বশতঃ Fifth nerve ও Glosso-pharyngeal নার্ভদ্বয় উদ্রিক্ত হইয়া উদরের মাংসপেশী-সমূহের আকুঞ্চন দ্বারা পক্কাশয়ের দূষিত দ্রব্যের সঞ্চার হইলে Vagus নার্ভ দ্বারা বমন কার্য্য সম্পাদিত হয়। কখন কখন মস্তিষ্কের (Vomitting centre in the medulla) উত্তেজিত হইয়া বমন করায়। যেমন কোন ঘৃণাকারজনক পদার্থ দেখিলেই আমরা বমন করি। এখানে সাক্ষাৎভাবে পক্কাশয় অথবা উদরে মাংসপেশী সমূহের সঙ্কোচ হয়না। দুষ্ট পদার্থ আমাদের মনে যে ঘৃণার ভাব জাগাইয়া দেয়, তাহাই Vomitting centre কে উদ্রিক্ত করিয়া বমন করায়।

(ঘ) শ্বাস—ফুস্‌ফুসের নিজের আকুঞ্চন প্রসারনের শক্তি নাই। বক্ষ ও উদরের মাংসপেশী সমূহের আকুঞ্চনপ্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ফুস্‌ফুস কুঞ্চিত ও প্রসারিত হইয়া থাকে। (The movements of the hug are therefore passive, not active, and depend upon the changes of shape of the closed cavity in which they are contained—Halliburton.)

Vagus, Splanchuick এবং Glosso-pharyngeal নামক নার্ভ'এর শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সম্পন্ন করে।

(ঙ) আহার—অন্ন চর্ব্বণ ও অধঃকরণের সমবেত কার্য্যদ্বারা আহারক্রিয়া সম্পাদিত হয়। 5th Nerve, Gloss-pharyngeal Sup—Laryngeal এবং Hypoglossas 'নার্ভের' সাহায্যে খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বিত হয়। চর্ব্বিত অন্ন অধঃকরণকালে যাহাতে নাসিকা বা ফুস্‌ফুস-পথে প্রবেশ না করে, তজ্জন্য উপজিহ্বা দ্বারা এই দুই ছিদ্রপথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং অন্ননালীর আকুঞ্চন দ্বারা উহা পক্কাশয়ে পতিত হয়।

উপযুক্ত কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনা করতঃ

* শরীর প্রচারান্মলিনীভূতং হি শোণিতং ফুস্‌ফুসপ্রচারেণ প্রাণবায়ুসমানীত বিষ্ণু পদামৃত (oxygen) সংযোগাৎ শুদ্ধীভূতং হৃদযন্ত্রেণ বিক্ষিপ্যতে সর্ব্বতো ধমনীভিঃ—প্রত্যক্ষ শারীরম।

আমরা দেখিতে পাইলাম যে, মস্তিষ্কাভ্যারস্থ 4th Ventricle নামক স্থান কতগুলি 'নার্ভ' বাহির হইয়া শীর্ষোরঃ কর্ণ জিহ্বাগ্রে নাসিকায় ব্যাপ্ত হইয়া "জীবনক্ষবথূদ্গার শ্বাসাহারাদি কর্ম্ম" সম্পাদন করে।

উদান বায়ু।—চরকে উদান বায়ুর স্থান "নাভ্যুরঃ কণ্ঠ" এবং তাহারকার্য্য 'বাক্‌প্রবৃত্তি প্রসত্নোর্জ্জবল বর্ণাদি কর্ম্ম' বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। সুশ্রুতে 'প্রসত্নোর্জ্জ বল বর্ণাদির উল্লেখ নাই। সুশ্রুতের মতে উদান বায়ু "ভাষিতগীতাদিবিশেষোহভি-প্রবর্ত্ততে।"

পশ্চাত্য মতে মস্তিষ্ক স্থিতবাক্‌কেন্দ্রে (Speech Sup. Laryngeal ও vagus প্রবৃত্তির উদ্রেক হয় এবং 'নার্ভদ্বয়ের কার্য্যদ্বারা স্বার যন্ত্র ও উদরের মাংস পেশীর সঙ্কোচ-জনিত নিঃসৃত-বায়ুই শব্দে সৃষ্টি করে। বাক্‌কেন্দ্র কোনরূপে নিষ্ক্রিয় করিয়া ফেলিলে মানব-মূকত্ব প্রাপ্ত হয়। বাদকের চেষ্টা—যন্ত্র এবং বায়ু নির্গমের সমবেত কার্য্য দ্বারা যেরূপ বংশীবাদন সম্পন্ন হয় তেমনি বক্তার ইচ্ছা—স্বরযন্ত্র ও উদরের পেশীসমূহের সমবেত কার্য্যদ্বারা বাক্য নির্গত হয়। বায়ুকে স্বরযন্ত্র দিয়া বাহির করিতে হইলে নাভির উপরের মাংসপেশী সমূহ এবং মহাপ্রচারিকা পেশীয় (Diaphgram) আকুঞ্চন আবশ্যক। এই সকল মাংসপেশীর কার্য্য তত্তৎ স্থানের নার্ভ সমূহের কার্য্য ব্যতীত সম্পাদিত হইতে পারে না। সুতরাং 'নাভ্যুরঃ কণ্ঠ' দেশের নার্ভের সাহায্যে 'ভাষিত গীতাদি' সম্পন্ন হয়।

৩। সমান বায়ু।—সমান বায়ুর স্থান আমাশয় ও পক্কাশয়। অন্নপাক ও পুষ্টিকর রস সমূহ এবং মূত্রপুরীষাদি যথাস্থানে প্রেরণ করা সমান বায়ুর কার্য্য। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের মতে ভুক্ত অন্ন পক্কাশয়ে প্রবেশ করিলে পক্কাশয়ের উর্দ্ধ ও অধঃ প্রদেশের ছিদ্রদ্বয় রুদ্ধ হইয়া যায় এবং পক্কাশয়ের সূক্ষ্ম পেশী সমূহ সঙ্কুচিত হইয়া ভুক্তদ্রব্যকে মৃদু পেষণ করে। অন্ন চর্ব্বণ ও অধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে পক্কাশয়ে Pepsin Hydrochoric acid' নামক এক প্রকার অম্ল-দ্রাবক রস ক্ষরিত হয়। এই দ্রাবক রস পক্কাশয়স্থ অন্ন কিয়ৎপরিমাণে জীর্ণ করে। অন্ন অর্দ্ধ জীর্ণ হইলে পক্কাশয়ের অধঃ দেশস্থ ছিদ্র উন্মুক্ত হয় এবং অর্দ্ধ জীর্ণান্ন আমাশয়ের ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে। এই স্থানে অন্ন কিল্লে (clyle) পরিণত হইয়া Thorocic duel নামক প্রণালী বহিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হয় এবং খাদ্যের অজীর্ণাংশ পুরীষে পরিণত হইয়া স্থূলান্ত্রে জমিয়া থাকে। (kidney) নামক যন্ত্র রক্ত হইতে মূত্র পৃথক করিয়া লয়। (The main function of the kidneys is to seperate the urine from the blood) পক্কাশয় ও আমাশয়ের এই সমস্ত কার্য্য vagus ও solar Plexus নামক Sympathetic nerves কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ Solar Plexus কে Abdominal Brain (উদরের কর্ম্মকেন্দ্র) বলিয়া বর্ণনা করিয়া উহার স্থান পক্কাশয়ের পশ্চাতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরকে সমানবায়ু স্বেদ, দোষ ও অম্বুবাহী বলিয়া কথিত হইয়াছে। Sympathetic নার্ভের বিকৃতিবশতঃ ঘর্ম্ম নির্গমের যে ব্যাঘাত ও ব্যতিক্রম হয়, তাহা প্রতীচ্য চিকিৎসক-গণও স্বীকার করেন (…increase of tem-

perature on the same side, alteration of the sweat secretion on the side, sometimes dimunition at other even an increase.) সুতরাং এক্ষেত্রেও সমান বায়ুর স্থান ও কার্য্যের সহিত পাশ্চাত্য নার্ভকেন্দ্র ও তাহাদের কার্য্যাবলীর সহিত কোন অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় না।

৪। ব্যান বায়ু।—ব্যান বায়ু "দেহং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বস্তু' এবং উহার কার্য্য গতি, প্রসারণ, আক্ষেপ ও নিমেষাদি ক্রিয়া। পাশ্চাত্যমতে শরীরের যাবতীয় কার্য্যই ত্রিবিধ নার্ভ-ক্রিয়াদ্বারা সম্পাদিত হয় (ক) Efferent (খ) Afferent ও (গ) Reflex অথবা প্রতিক্রিয়া জনিত কার্য্য পুনরায় Excito motor Excito-secretory Excito-accelerator এবং Excito-Inhibitory—এই চারি প্রকারে কার্য্য করে। শেষোক্ত দুই প্রকার প্রতিক্রিয়া জনিত কার্য্যের উপর আমাদের "নাড়ী" বিজ্ঞানের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। রক্তবাহী প্রণালী সমূহ (arteries and veins) sympathetic nerves দ্বারা চালিত ও পুষ্ট হইয়া থাকে, প্রতীচ্যবুধমণ্ডলী এ বিষয় জ্ঞাত থাকিলেও, আর্য্য চিকিৎসকদিগের ন্যায় তাঁহারা এ সম্বন্ধে এখনো যে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা তাঁহারাই স্বীকার করিয়াছেন। (Morbid his to logical changes, such as atrophy, pigmentary or patty deegenarations fibrosis and homorrohage, have been found in the ganglia of the sympathetic system, but little appears to be known of definite association between such changes and functional disturbances or symptoms as a consequence —Joylor) সুতরাং গতিপ্রসারণ, আক্ষেপ, নিমেষাদি ক্রিয়া যে নার্ভদ্বারা সম্পাদিত হয় এবং ঐ সকল নার্ভ যে সর্ব্বদেহে ব্যাপ্ত রহিয়াছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। এখানেও ব্যান বায়ু ও Motor sensory নার্ভ সমূহের কার্য্যাবলীতে কোন পার্থক্য দেখা যায় না।

৫। অপান বায়ু।—অপান বায়ুর স্থান "বৃষণৌ বস্তি মেঢ্রঞ্চ নাভ্যাঞ্চ বংক্ষনৈ গুদম্" এবং তাহার কার্য্য শুক্র, মূত্র, পুরীষ, গর্ভ ও আর্ত্তব পরিত্যাগ করা। পাশ্চাত্য মতে মূত্র, পুরীষ ত্যাগ প্রভৃতি কখনো কখনো volition বা স্বতঃপ্রবৃত্তির দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। শিশুদিগের মূত্র, বিষ্ঠা-ত্যাগ, ক্রিমি অথবা অন্য কোন দ্রব্যের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সম্পন্ন হয় (It also may be reflexly in children, who suffer from intestical worms, or other such irritation—Hallsburton) সাধারণতঃ শুক্র, মূত্র, পুরীষ, গর্ভ ও আর্ত্তব নির্গমের মার্গসমূহের মাংসপেশীগুলির আকুঞ্চনের দ্বারা উহারা নির্গত হইয়া থাকে। Lower dorsals, upper hunbers, sympathetics, Hypogastric, pudic ও sacoral নার্ভ সমূহ সাক্ষাৎভাবে মূত্র পুরীষ প্রভৃতি নির্গমের সাহায্য করে। উহাদের স্থান "বৃষণৌ বস্তি'..." ইত্যাদি। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে এখানেও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতের কোন বিরোধ বা ব্যতিক্রম দেখা যায় না। (ক্রমশঃ)

কবিরাজ শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত।

আজকাল কাস রোগের এত আধিক্য কেন ?

—:০:—

আয়ুর তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গুহ্য তত্ত্ব সমূহ একমাত্র আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেই আছে। ইহা তন্ত্রোক্ত শাস্ত্র এবং অথর্ব্ব ও যজুর্ব্বেদের অংশ। ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি প্রভৃতি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ ব্যাধি প্রপীড়িত জন সমূহের মঙ্গলার্থে ভারতবর্ষেই ইহা প্রথম প্রচার করেন। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ব্যাধি চতুর্ব্বিধ,—যথা দোষজ, কর্ম্মজ, কুলজ ও পাপজ। দোষজ অর্থাৎ ইহ জন্মে পাপাচার জনিত বাতাদি দোষের প্রকোপ হেতু যে ব্যাধি। কর্ম্মজ অর্থাৎ ইহ জন্মে নিজকর্ম্ম দোষে অর্থাৎ জ্ঞানকৃত পাপাচরণ হেতু যে ব্যাধি। কুলজ অর্থাৎ বংশ পরম্পরা ক্রমে যে ব্যাধির উৎপত্তি। আর পাপজ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের অপরাধ হেতু যে ব্যাধি। এই চতুর্ব্বিধ কারণে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মহাদেবকে (মহারুদ্রকে) সংহার কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মহারুদ্রদেবের ক্রোধজনিত নিশ্বাস হইতে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য রুদ্রানুচর উৎপন্ন হইয়া ব্যাধিরূপে পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেছে এবং অধর্ম্মাচারীদিগকে শাস্তি দিতেছে ও নাশ করিতেছে। তাই যজুর্ব্বেদে রুদ্রাধ্যায়ে উক্ত আছে যে "অসংখ্যাতা সহস্রানি যে রুদ্রা আধিভূম্যাম্। তেষাং সহস্র যোজনে অবধন্বানি তন্মাস" ইত্যাদি। অর্থাৎ হে ভগবন্, যে সকল অসংখ্য অসংখ্য অমঙ্গলময় রুদ্র মৃত্তিকার উপর (পৃথিবীতে) বিচরণ করিতেছে, আমরা যেন তাহাদিগের নিকট হইতে সহস্র যোজন দূরে থাকি। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুদ্রানুচর বা (সংহার বীজের) সহিত ডাক্তারদিগের বীজাণুর কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়। পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদ ডাক্তারদিগের মতেও অধিকাংশ রোগই বীজাণু সমুদ্ভূত। আর আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মতে পৃথিবী অধর্ম্ম বহুল হইলেই রুদ্রানুচরেরা অধর্ম্মচারীদিগকে বায়ু, জল, আকাশ প্রভৃতি নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া ধ্বংস করিয়া থাকেন। এজন্য আর্য্য ঋষিগণ, যথা আহার-বিহার নিবারণ কল্পে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া (অর্থাৎ অমুক তিথিতে অমুক দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মহত্যা পাতকগ্রস্ত হইতে হয় ইত্যাদি) সমুদায় কার্য্যই শুদ্ধাচার সম্পন্ন হইয়া নির্ব্বাহ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এইজন্য আর্য্যগণ স্নান, পান, ভোজন, শয়ন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই সেকালে শুদ্ধাচার সম্পন্ন থাকিতেন, এবং স্পর্শাক্রামক রোগের ভয়ে নীচ জাতির কথা দূরে থাকুক, স্বজাতি ভিন্ন কোনও জাতির সহিত একাসনে উপবেশন করিতেন না, এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, শুদ্ধসত্ত্বতা ও নিষ্ঠাবান থাকিয়া সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ অধিকাংশ রোগই যে সংক্রামক, এ তথ্য জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই সংস্পর্শ দোষ ও শুদ্ধাচারের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন। আর এক্ষণে পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানবিদ-ডাক্তারেরা চিকিৎসা বিজ্ঞান অপেক্ষা (হাইজিন) স্বাস্থ্য-

বিজ্ঞানেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। ডাক্তারদিগের মতে সর্দ্দি-কাসি-নিউমোনিয়া প্রভৃতির বীজাণু সর্ব্বদাই দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে "প্রতিশ্যায়াদথোকাসঃ কাসাৎ সংজায়তে ক্ষয়ঃ।" উপেক্ষিত হইলে প্রতিশ্যায় অর্থাৎ নাসাস্রাব (সর্দ্দি) হইতে কাস এবং কাস হইতে ক্ষয়রোগ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু হায়, কালস্রোতে আমাদিগের কি অধঃপতনই হইয়াছে! পেটের দায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আমরা এক্ষণে আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সর্ব্ববিষয়েই নানা জাতীয় লোকের সংস্পর্শে থাকিয়া স্পর্শাক্রামক ব্যাধি সকল দ্বারা আক্রান্ত হইতেছি। ডাক্তারদিগের মতে লোক সংখ্যা যেখানে অধিক, তথায় বীজাণু সংখ্যাও অধিক, এবং রোগ-বীজাণু রোগী-দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে। আর আমাদিগের মতে অল্পস্থানে অধিক লোকের অবস্থান ও নানা জাতীয় লোকের সহিত সহবাসহেতু সংস্পর্শ দোষই কাস রোগের প্রধান কারণ, দ্বিতীয় কারণ বদ্ধ বায়ুতে অবস্থান, তৃতীয় কারণ চাকুরির জন্য অসময়ে ও অযথা আহার। এইজন্য কলিকাতা মহানগরীতে কাসরোগের এত আধিক্য দেখা যায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তারদিগের মতে অধিকাংশ রোগই বীজাণু সমুদ্ভূত। এই বীজাণু আবার দুই অংশে বিভক্ত, জীবাণু ও উদ্ভিজ্জাণু। প্রাণীদেহের ন্যায় উদ্ভিদ-দেহও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা গঠিত। ম্যালেরিয়া প্রভৃতি কয়েকপ্রকার রোগ শুদ্ধ জীবাণু কর্ত্তৃক উৎপন্ন। উদ্ভিজ্জাণু হইতে অধিকাংশ রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। এই বীজাণু দ্বারা আকাশ, বায়ু, জল প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই পূর্ণ। তবে যে স্থানে জল সংখ্যা অধিক, তথায় বীজাণুর সংখ্যাও অধিক। এই বীজাণু শ্বাস-প্রশ্বাস, পানীয় জল, আহার্য্যসামগ্রী, ধূলিকণা এবং মশা-মাছি ইত্যাদি দ্বারা মনুষ্যদেহে প্রবেশ করে। তবে সকল প্রকার বীজাণু রোগোৎপাদন করে না। রোগোৎপাদনকারী বীজাণু সংখ্যা অল্প। মানবদেহে দেহস্থ রসের এবং কোষ সমূহেরও বীজাণু নাশক ক্ষমতা আছে, এজন্য সর্ব্বদা রোগাক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ শরীরস্থ রোগ-প্রতিষেধক শক্তির হ্রাস হইলে, অর্থাৎ শারীরিক অত্যাচারবশতঃ বা অত্যধিক ইন্দ্রিয়সেবা বশতঃ অতিরিক্ত পরিশ্রম বা ব্যায়াম বশতঃ, অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম বশতঃ এবং রাত্রি জাগরণ, অনুপযুক্ত আহার, রুদ্ধগৃহে অবস্থান, উদ্বেগ, ভয় ও মানসিক অবসন্নতা প্রভৃতি কারণে কোষ সমূহের বীজাণু নাশক ক্ষমতার হ্রাস হইলে রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধারণতঃ রোগ-বীজাণু রোগীর দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রামিত হইয়া থাকে, এইজন্য রোগীর ব্যবহৃত বস্ত্রাদি, আহার্য্য-পাত্র প্রভৃতি ব্যবহার করা উচিত নহে। অধিক কি—রোগীর মল, মূত্র, থুথু, কফ, বমিত পদার্থ, এমন কি নখ লোমাদি কর্ত্তিত পদার্থের সহিত তাহার শরীরের অসংখ্য বীজাণু নির্গত হইয়া দেহান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। এইজন্য পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ ডাক্তারেরা আজকাল চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছাড়িয়া স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেই বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। অর্থাৎ সুস্থাবস্থায়, কিরূপ পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা

আবশ্যক, কিরূপ আচার ব্যবহারে থাকা কর্ত্তব্য, কিরূপ জলবায়ু ব্যবহার্য্য, কিরূপ আহারাদি আবশ্যক ও শ্রেয়স্কর এবং কিরূপ লোক সমূহের সংস্পর্শ ত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যানুসন্ধানেই অধিকভাবে মনোযোগ প্রদান করিয়াছেন। ইঁহাদিগের মতে সর্দ্দি-কাসি-নিউমোনিয়া প্রভৃতি বীজাণু সর্ব্বদাই দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগিয়া বা অন্য কোন কারণবশতঃ দেহের রোগপ্রতিষেধক ক্ষমতার হ্রাস হইলেই কাস রোগোৎপত্তি হইয়া থাকে। *

শ্রীশশিভূষণ গুপ্ত।

আয়ুর্ব্বেদ-সমস্যা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধসমূহের ফল যেরূপ শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, আজকাল অনেক ঔষধেই তাহার কিয়ৎপরিমাণও প্রত্যক্ষীভূত হয়না দেখিয়া, আমার মনে কতগুলি গুরুতর সমস্যার উদয় হইয়াছে। যে সর্ব্বরোগহর মহৌষধ জরামরণনাশন, তাহা অবিশ্রান্ত সেবন করিয়া আমরা সামান্য ব্যাধির উৎপীড়ন হইতেও অব্যাহতি পাইতেছিনা, এবং যে পরম রসায়নের প্রভাবে বিগতেন্দ্রিয় চ্যবন মুনি "সুবৃদ্ধোঽভূত পুনর্যুবা", তাহা অবিরত উদরস্থ করিয়া যৌবনেও আমরা আমাদের সামান্য শক্তিটুকু পর্য্যন্ত কয়েক দিন মাত্র অব্যাহত রাখিতে পারিতেছি না, এতদপেক্ষা বিস্ময় ও পরিতাপের বিষয় আর কিছু হইতে পারে কি! এই বৈচিত্র্যের নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ বিদ্যমান আছে। আর্য্যঋষির উক্তি যদি প্রমত্তের প্রলাপ না হয়, তাহা হইলে আমরা যে এখন ঠিক সেই ঔষধই পাইতেছি, অথচ উহাতে পূর্ব্ববৎ সুফললাভ হইতেছে না, এমন কথা কখনই অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার করিতে পারা যায় না। সত্য বটে, বর্ত্তমান সময়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার ফল যতটুকু দেখা যায়, তাহাও অনেকস্থলে অন্যান্য চিকিৎসা-প্রণালী অপেক্ষা

---

* সংস্পর্শ দোষই সংক্রামক রোগ বৃদ্ধির কারণ। এক হুঁকায় তামাকুসেবন, এক পেয়ালায় চা পান—এ সকল কারণেও যে দেশে কাস রোগের আধিক্য ঘটিতেছে না, তাহাই বা কে বলিতে পারে? ইতঃপূর্ব্বে আমাদের "কাজের কথা" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা এ সকল কথার উল্লেখ করিয়াছি। সিগারেটের প্রচলনাধিক্যও কাসরোগ বাড়িবার একটি কারণ। আমাদের এই যুক্তির সহিত মাধবের কাস নিদানের ত মতানৈক্য নাই। মাধব ত বলিয়াই গিয়াছেন,—

"ধূমোপঘাতাদ্রসতস্তথৈব ব্যায়াম রুক্ষান্ন নিষেবণাচ্চ
বিমার্গগত্বাচ্চ হি ভোজনস্য বেগাবরোধাৎ ক্ষয়থোস্তথৈব।"

—আং সং

অধিক ; কিন্তু আমার মনে হয়, আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধগুলি যদি যথোচিত ফলবিধানে সমর্থ হইত, তাহা হইলে তাহাদের আশ্চর্য্য প্রতীকার-শক্তি দর্শনে নিশ্চয়ই জগদ্বাসী স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন।

অবশ্য কালধর্ম্মে বনজ ভেষজাদির কথঞ্চিৎ হীনবীর্য্য হওয়ার আশঙ্কা একেবারে অমূলক নহে ; কিন্তু দ্রব্যাদির শক্তি কথঞ্চিৎ হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও তন্নিমিত্ত ফলের এত পার্থক্য কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। অধিকন্তু, কালধর্ম্মের প্রভাব হইতে যখন আমরাও অব্যাহতি পাই নাই, তখন দ্রব্যাদির এই শক্তিহীনতা আমাদের তত ক্ষতির কারণ না ও হইতে পারে। বিগত কয়েক বৎসর যাবত আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের প্রস্তুত-প্রণালী সম্বন্ধে সন্ধান লইয়া আমি যে সকল বৈচিত্র্যের পরিচয় পাইয়াছি, আমার বিশ্বাস, ঔষধের ফলহানির নিমিত্ত তাহাই প্রধানতঃ দায়ী ; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার উন্নতির নিমিত্ত সে সকল গোলযোগের মীমাংসা করিয়া, ঔষধপ্রস্তুতের প্রকৃতপ্রণালী-প্রচারই আমি এখন আয়ুর্ব্বেদ-হিতৈষিগণের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। এ সম্বন্ধে বহু বিষয়েরই আলোচনা করা আবশ্যক হইলেও, প্রধানতঃ যে সকল ব্যাপারে আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়িগণের এবং দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের সমান স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি নিম্নলিখিত বিষয় কয়টী মাত্র সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি :—১। ঔষধার্থ ব্যবহৃত ভেষজাদি, ২। মান-পরিভাষা, ৩। ঔষধের মাত্রা, ৪। ঔষধের উপাদান-বৈষম্য, ৫। ঔষধ-প্রস্তুত-প্রণালী, ৬। জারিত ধাতু, ৬। ঘৃত, ৮। মকরধ্বজ ও স্বর্ণসিন্দূর, ৯। চ্যবনপ্রাশ।

ঔষধার্থ ব্যবহৃত ভেষজাদি—ঔষধ-প্রস্তুতের জন্য যে সকল দ্রব্য গৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধে নানাপ্রকার গোলযোগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাবে এখন অনেক আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকই উদ্ভিজ্জ ও খনিজ ভেষজাদি নিঃসংশয়িতরূপে চিনিতে সক্ষম নহেন ; কাজেই ঔষধ-সরবরাহ-কারী "বেদে" ও "বেণে"দিগের উপর এ নিমিত্ত তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়। এই বেদে এবং বেণেরা যে সকল সময় প্রকৃত জিনিষ আহরণ করিয়া থাকে, এমন কথা বোধ হয় কেহই শপথ করিয়া বলিতে প্রস্তুত হইবেন না।

ঔষধার্থ গৃহীত দ্রব্যাদির কথাই আমার এস্থলে বিশেষভাবে আলোচ্য। সকলেই জানেন, শার্ঙ্গধর বলিয়াছেন—

"শুষ্কং নবীনং যৎ দ্রব্যং যোজ্যং সকলকর্ম্মসু"।
"গুড়ূচী কুটজো বাসা কুষ্মাণ্ডশ্চ শতাবরী,
অশ্বগন্ধ সহচরৌ শতপুষ্পা প্রসারণী।
প্রযোক্তব্যা সদৈবার্দ্রা।"

সুতরাং শার্ঙ্গধরের মতে গুড়ূচী, কুটজ প্রভৃতি দশটী, এবং মতান্তরে "বাসানিম্বপটোলকেতকি" প্রভৃতি বচনানুসারে বাসকাদি উনিশটী দ্রব্য ব্যতীত ঔষধার্থ ব্যবহার্য্য অপর সমস্ত দ্রব্যই "নবীন অথচ শুষ্ক" হওয়া আবশ্যক। 'শুষ্কদ্রব্যস্য যা মাত্রা আর্দ্রস্য দ্বিগুণা হি সা" এই বচন যে কেবল নিতান্ত প্রয়োজনের সময় অভাবপক্ষেই প্রযোক্তব্য, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই ; বিভিন্ন ঔষধ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়াতেই শাস্ত্রকার-

গণের উক্ত উদ্দেশ্য উত্তম রূপে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। কিন্তু আমি বহু স্থলে দেখিয়াছি, উল্লিখিত তালিকার বহির্ভূত অনেক দ্রব্য কাঁচা অবস্থায়ই ঔষধে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এবং কোন কোন প্রধান চিকিৎসকও আমাকে বলিয়াছেন যে, কাঁচা জিনিষই নাকি অধিকতর ফলপ্রদ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দশমূলের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। দশমূলে মূলের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে যে কেবল বল্কলই প্রদত্ত হয়, এমন নহে, ঐ সকল দ্রব্যাদি উল্লিখিত তালিকার অন্তর্ভূত না হইলেও বেল, শোণা, গণিয়ারী, শালপানি প্রভৃতি প্রায় সকলই কাঁচা গৃহীত হইতে দেখা গিয়া থাকে। তা'রপর, যে কয়েটী জিনিষ কাঁচা ব্যবহার করার কথা উল্লিখিত বচনে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার মধ্যেও যে কোন কোন জিনিষ শুষ্কই গ্রহণ করা হয়, অশ্বগন্ধাই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত বেণেরা যে সকল বনজ ভেষজের সরবরাহকারী, সে সকল অতিশুষ্ক দ্রব্যের "নবীনত্বের" সীমা কোথায়, তাহা বোধ হয় কোন আয়ুর্ব্বেদব্যবসায়ীরই অবিদিত নহে। বেণের দোকানে ঐ সকল দ্রব্যাদি কিভাবে রক্ষিত হয়, তাহাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক ভেষজসরবরাহের ভার স্বহস্তে গ্রহণ না করিলে ইহার সমুচিতপ্রতিকারের আশা সুদূরপরাহত। এইরূপে শুষ্কদ্রব্যের স্থলে কাঁচা জিনিষ, কাঁচার স্থলে শুষ্ক পদার্থ ও অতিপুরাতন শুষ্ক দ্রব্যাদি এবং মূলের স্থলে বল্কল গ্রহণের ফলে ঔষধের গুণবৈষম্য ঘটিতেছে কি না এবং ঘটিলেই বা কিরূপে ইহার প্রতিকার করা যাইতে পারে, আশা করি, আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই তাহা বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

এ প্রসঙ্গে আমি আর একটী বিষয়েও চিকিৎসকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। আমি দেখিয়াছি, একই নামে বিভিন্ন জিনিষ বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; দৃষ্টান্তস্বরূপ রাখাল-শশা, গাম্ভারী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই সকল একই নামের বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত ভেষজ—তাহা নির্ণীত হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত একই জিনিষের বহু প্রকারভেদও দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে; যেমন "তুলসী", "ধুতুরা", "পান" প্রভৃতি। ইহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে কোন্‌টী ঔষধে ব্যবহার্য্য, তাহা নির্দ্ধারিত এবং সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। প্রসিদ্ধ ভেষজ বিদারী সম্বন্ধেও নানা গোলযোগ চলিতেছে। এই বিদারী দুই প্রকার; ইহাদের লতা যেমন ভিন্ন রকমের, স্বাদও তেমনি বিভিন্ন, এবং সম্ভবতঃ গুণেও কতক বৈষম্য থাকিতে পারে। এদেশে সাধারণতঃ ইহার একটীকে ক্ষীরবিদারী এবং অপরটীকে ভূমিকুষ্মাণ্ড বলা হয়। আমি যতদূর দেখিয়াছি, ঔষধাদির বর্ণনায় প্রায় সর্ব্বত্রই "বিদারী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এবং কচিৎ দুই এক স্থলে "ভূকুষ্মাণ্ড" (যথা—সিদ্ধশাল্মলীকল্পে) এবং কোথায়ও বা "বিদারীদ্বয়ং" (যথা—শিবাগুড়িকায়) এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রকার যে উভয় প্রকার বিদারীই গ্রহণ করিয়াছেন, "বিদারীদ্বয়ং" কথা হইতেই তাহা প্রকাশ পাইতেছে। এখন যে স্থলে কেবল বিদারী লিখিত আছে, তথায় উভয় প্রকার বিদারীর মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণীয়,

তাহা নির্দ্ধারিত হওয়া আবশ্যক; নচেৎ যাহার যেটি ইচ্ছা, সেটি ব্যবহার করিলে, ঔষধের ফলবৈষম্য অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং কোন্ শ্রেণীর বিদারী কোন্ স্থলে গ্রহণ করিতে হইবে, চিকিৎসকগণ তাহা নির্ণয় না করিলে অসুবিধা দূরীভূত হইবেনা।

মান-পরিভাষা—ঔষধ প্রস্তুতের জন্য গৃহীত দ্রব্যাদির পরিমাণ সম্বন্ধে নানা স্থানে বিভিন্নমত দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। শাস্ত্রে আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের মান অনেকস্থলে মাষা ও কর্ষ হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে. এই মাষা এবং কর্ষের পরিমাণ লইয়াই মতভেদ। মাগধ এবং কালিঙ্গ ভেদে আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থে দ্বিবিধ মানের পরিচয় পাওয়া যায়; এই মাগধ মানের পরিমাণ কালিঙ্গ মানের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক অধিক। শার্ঙ্গধর মাগধ ও কালিঙ্গ মানের যে পরিভাষা দিয়াছেন, "পরিভাষা-প্রদীপ"—ধৃত বচনে তাহার কথঞ্চিৎ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। শার্ঙ্গধরের মতে মাগধ মানে মাষার পরিমাণ ৬ রতি যথা—

"ষড়্ভিস্তু রক্তিকাভিঃ স্যান্মাষকো হেমধান্যকৌ।"

কিন্তু পরিভাষাপ্রদীপে ঐ মাষার পরিমাণ ১০ রতি যথা:—

"গুঞ্জাভি র্দশভিঃ প্রোক্তো মাষকো ব্রহ্মণা পুরা।"

ইহার পর শার্ঙ্গধর এবং পরিভাষাপ্রদীপ উভয় গ্রন্থেই মাগধমানে ৪ মাষায় ১ শাণ, ২ শাণে ১ কোল এবং ২ কোলে ১ কর্ষ ধরা হইয়াছে। পরন্তু কালিঙ্গ মানে শার্ঙ্গধরের মতে ১ মাষার পরিমাণ ৮ কদাচিৎ বা ৭ রতি—

"মাষো গুঞ্জাভিরষ্টাভিঃ সপ্তভির্বা ভবেৎ ক্বচিৎ"।

কিন্তু পরিভাষা প্রদীপে দেখা যায়, কালিঙ্গমানের মাষা ৬ রতি। কালিঙ্গ মানের কর্ষ শার্ঙ্গধরের মতে ১০ মাষায় (কর্ষ স্যাদ্দশমাষকঃ); কিন্তু পরিভাষা-প্রদীপের মতে এই মানের কর্ষ ১৬ মাষায় (মাষৈশ্চতুর্ভিঃ শাণঃ স্যাৎ * তদ্দ্বয়ং কোল উচ্যতে * কোলদ্বয়ঞ্চ কর্ষঃ স্যাৎ)। এই উভয় মতের মধ্যে কোন্‌টী প্রকৃত, তাহা বুঝিবার উপায় আমাদের নাই; তবে শার্ঙ্গধর মৌলিক গ্রন্থ বলিয়া উহাই প্রামাণ্য মনে হয়। দেশবাসীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া শার্ঙ্গধর কালিঙ্গমানকেই এ কালের উপযুক্ত মান করিয়াছেন যথা—

যতো মন্দাগ্নয়ো হ্রস্বা হীনসত্ত্বা নরাঃ কলৌ।
অতস্তু মাত্রা তদ্যোগ্যা প্রোচ্যতে সুজ্ঞসম্মতা॥

চরক এবং সুশ্রুতের মান আবার অন্যরূপ। চরক ১০ রতিতে এবং সুশ্রুত তাহার অর্দ্ধ অর্থাৎ ৫ রতিতে মাষা নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু এ দেশের আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায়িগণের মধ্যে কেহ বা চরক, কেহ বা শার্ঙ্গধর এবং কেহ বা পরিভাষা-প্রদীপের মত অনুসরণ করিলেও, অধিকাংশ চিকিৎসকই আর এক অভিনব মানের মাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন; সেই হিসাবে ১ মাষার পরিমাণ ১২ রতি বা ৵০ আনা। মাষার পরিমাণের এইরূপ হ্রাসবৃদ্ধি দ্বারা ফলের কোনরূপ বৈষম্য ঘটে না, এমন কথা বোধ হয় কেহই দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারিবেন না।

চরকসংহিতার প্রণেতা যদি অগ্নিবেশ ঋষি হইয়াথাকেন, তাহা হইলে উহা নিশ্চয়ই শার্ঙ্গধর ও সুশ্রুতের পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ। এ

অনুমান সত্য হইলে, চরকের মাষার মান-বৃদ্ধির একটা যুক্তিযুক্ত কারণ কল্পনা করা যাইতে পারে; কারণ সে সময় মানবগণ অতিশয় বীর্য্যবান ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে মানবগণের দুর্ব্বলতা দর্শন করিয়া, শার্ঙ্গধর ৬ রতিতে এবং সুশ্রুত ৫ রতিতে মাষা গ্রহণই সমীচীন মনে করিয়া থাকিবেন। আমাদের বর্ত্তমান বল-বীর্য্যাদি বিবেচনা করিয়া, বিশেষতঃ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-বিজ্ঞান ঔষধের অত্যল্পতার যে অত্যধিক ক্ষমতা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া, একালে শার্ঙ্গধর কি সুশ্রুতের অনুসরণই সুসঙ্গত মনে হইলেও, এ দেশের আয়ুর্ব্বেদাচার্য্যগণ ১২ রতিতে মাষা ধরার আবশ্যকতা অনুভব করিলেন কেন, তাহা বুঝিবার শক্তি আমার মত অবোধের নাই। কাযেই এই মানের গোলযোগে ঔষধের ফলবৈষম্য ঘটিতে পারে কি না, এবং ঘটিলেই বা তাহার কিরূপ প্রতিকার করা যাইতে পারে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আমি কবিরাজ মহাশয়দিগকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীমুকুন্দবিহারী চক্রবর্ত্তী।

পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা।

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র (Modern Medicine) প্রবর্ত্তন হইবার পূর্ব্বে জগতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন হয়। তন্মধ্যে কতকগুলিও লোপ পাইয়া গিয়াছে, কতক গুলি কঙ্কালসার অবস্থায় পরিণত হইয়া কোন মতে জীবন ধারণ করিতেছে। ঐ পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্র গুলির মধ্যে আমরা অল্প প্রধান গুলির উৎপত্তি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ১। পুরাতন "মিশর" দেশীয় চিকিৎসা শাস্ত্র (old Egyptian Medicine.) ২। পুরাতন "গ্রীক্" চিকিৎসা শাস্ত্র (old Greek Medicine) ৩। আরব চিকিৎসা শাস্ত্র যাহাকে আমাদের দেশে "হেকিমী" চিকিৎসা শাস্ত্র কহে এবং যাহার অপর একটীর নাম "ইউনানি" চিকিৎসা শাস্ত্র। (Arabian Medicine) ৪। আমাদের "আয়ুর্ব্বেদ"—চিকিৎসা শাস্ত্র। (Hindu Medicine) এইসব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি—সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনিষীগণের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন মতগুলি প্রদর্শিত হইল।

১। আয়ুর্ব্বেদ সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র। উহা হইতে মিশর, মিশর হইতে গ্রীক্ এবং গ্রীক্ হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ২। আয়ুর্ব্বেদ ও প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র উভয়েই পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত। মিশর হইতে গ্রীক্ এবং গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৩। প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র—সর্ব্বপ্রথম চিকিৎসা শাস্ত্র। উহা

হইতে গ্রীক ও আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি। গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৪। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্র পুরাতন মিশর ও হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র এই উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উৎপত্তি। গ্রীক হইতে আরব চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি। ৫। পুরাতন মিশর হইতে গ্রীক্, গ্রীক হইতে আরব এবং আরব চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আয়ুর্ব্বেদের উৎপত্তি।

পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে আমরা সামান্য অবগত আছি। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎগণ মিশর হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে ছয়টী হস্তলিপি (papyrus) উদ্ধার করিয়াছেন।

১। ইবারর্স বা লিপ্‌জিক্ প্যাপিরাস্ অনুমান খৃষ্ট জন্মিবার সাড়ে পোনের শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। ২। প্রধান বার্লিন বা লিডেন প্যাপিরাস্ অনুমান খৃষ্ট জন্মিবার চতুর্দ্দশ শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত। ৩। দ্বিতীয় বার্লিন প্যাপিরাস্। ৪। হিয়ার্ষ্ট প্যাপিরাস্। ৫। বৃটীশ মিউজিয়ামে রক্ষিত প্যাপিরাস্। ৬। প্যারিসে রক্ষিত প্যাপিরাস্।

উপরিউক্ত ছয়টী প্যাপিরাস্ মধ্যে "ইবারর্স প্যাপিরাস্" অতি পুরাতন এবং উহা হইতে পুরাতন মিশর দেশীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হওয়া যায়। প্রধান বার্লিন প্যাপিরাসের সহিত আমাদের "অথর্ব্ববেদের" অনেক বিষয়ে ঐক্যতা দেখা যায়।

যাঁহারা বলেন যে প্রাচীন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ হইতে উদ্ভূত তাঁহাদের ঐরূপ মতের প্রধান কারণ যে ঐতিহাসিক যুগের পূর্ব্বে ভারতবাসী মিশরে যাইয়া সভ্যতার আলোক বিস্তার করেন। অপর পক্ষে বলেন যে আয়ুর্ব্বেদ ও পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত। আমাদের শেষোক্ত মতই বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে হয়, কারণ অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মত এই যে, মিশরের সভ্যতা আমাদের সভ্যতা হইতে অতি প্রাচীন। আমাদের অথর্ব্ববেদ ও মিশরের প্যাপিরাস্ যদি সমসাময়িক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে সে সময়ের চিকিৎসা শাস্ত্র চিকিৎসার প্রাথমিক অবস্থা অর্থাৎ স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রসূত; যুক্তি বা পরীক্ষাপ্রসূত নহে। "Primitive stage by Instinct"। অবশ্য মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র প্রাথমিক অবস্থা হইতে অনেক অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের গৌরবের বিষয় এই যে, উহা আমাদের আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় এত উন্নত হয় নাই এবং মিশরের সভ্যতার সহিত মিশরের চিকিৎসা শাস্ত্র কালের সুদূর-গর্ভে লীন হইয়া গিয়াছে। বাজ সাহেবের মত হইতেও জানিতে পারা যায় প্রাচীন মিশর-চিকিৎসা প্রাচীন গ্রীক বা আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় উন্নতি সাধন করে নাই।

(২) প্রাচীন গ্রীক ও রোমক চিকিৎসা শাস্ত্র—এই শাস্ত্রের ক্রমোন্নতি চারিটী ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। প্রথম অবস্থা—primitive stage derived from instinct up to 1200 B.C.

৪। দ্বিতীয় অবস্থা—Sacred or mystic stage—Rise of Pythagorian school up to 500 B.C.

৩। তৃতীয় অবস্থা—Philosophic stage—Rise of Hippocratic and other schools up to 300 B.C.

৪। চতুর্থ অবস্থা—Anatomic stage —up to Gahn is 200 A D.

গ্রীক্ চিকিৎসা শাস্ত্র, পুরাতন মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র উদ্ভূত—ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত মত। এখন দেখা যাউক, আয়ুর্ব্বেদের সহিত গ্রীক্ চিকিৎসা সম্বন্ধে কি সম্পর্ক? এ বিষয়ে তিনটী মতভেদ আছে।

১। গ্রীক্ চিকিৎসা শাস্ত্র মিশর ও হিন্দু উভয়বিধ চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে উদ্ভূত।

২। গ্রীক্ ও আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা পরস্পরের সাহায্য ব্যতিরেকে উন্নত ও পরিবর্দ্ধিত অর্থাৎ উভয়ই এক বৃক্ষের ফল।

৩। গ্রীক্ হইতে আরব এবং আরব হইতে হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎপত্তি।

প্রাথমিক অবস্থা—কি মনুষ্য কি জীবজন্তু, প্রাণীমাত্রেরই চিকিৎসা সম্বন্ধে স্বাভাবিক বুদ্ধি প্রসূত একটী জ্ঞান ছিল। অসভ্য মানবদিগের এবং জাতি মাত্রেরই সভ্যতার পূর্ব্বে ঔষধাদির একটা জ্ঞান ছিল। সেই জ্ঞান সভ্যতার উন্নতির সহিত বর্দ্ধিত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রের উৎপত্তি হয়। গ্রীক, হিন্দু প্রভৃতি সভ্যজাতির সভ্যতার প্রথম অবস্থায় কতকটা সাধারণ জ্ঞান ছিল।

দ্বিতীয় অবস্থা—এই অবস্থায় চিকিৎসা শাস্ত্রের সূত্রপাত হয়। এই সময়ে পণ্ডিত প্রবর পাইথেগোরাসের অভ্যুদয় হয়। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের অনেক উন্নতি সাধন করেন। চিকিৎসা শাস্ত্রে তাঁহার প্রধান দান—রোগ ভোগের দিন নিরূপণ "the celebrated doctrine of numbers—the doctorin of critical days"—Eucyclopardia Britanuica.

রোগভোগের দিন সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বায়ুজ্বরের ভোগ ৭ দিন, পিত্তজ্বরের ১০ দিন, কফ জ্বরের ১২ দিন প্রভৃতি।

আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় হেকিমী চিকিৎসাশাস্ত্রেও রোগ-ভোগের দিন সম্যকভাবে নির্দ্ধারিত আছে। অবশ্য হেকিমগণ গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছেন।

আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র রোগভোগের নিরূপিত দিনের কথা বিশ্বাস না করিলেও একেবারে উহা বিস্মৃত হয় নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ —নিউমোনিয়ার ক্রাইসিস্ (নিরাম অবস্থা) সাত দিনে হয় পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রে লিখিত আছে—উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিন দিনের জ্বর (Three day Fever) সাত দিনের জ্বর (seven day fever) প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত ডাক্তারগণও স্বীকার করেন।

ইলিয়ট সাহেব তাঁহার গ্রীক্ ও রোম্যান্ মেডিসিন্ নামক পুস্তকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, নাইথেগোরাস,মিশর, ফিনিসিয়া, ব্যালডিয়া এবং সম্ভবতঃ ভারতবর্ষে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে আসিয়াছিলেন।

তৃতীয় অবস্থা—এই সময়ে গ্রীক্ চিকিৎসা শাস্ত্রে দুইটী ভিন্ন মতাবলম্বী দলের অভ্যুদয় হয়। এক দলের নাম এম্পিরিক্স (Empirics)। উহাঁদের বিদ্যামন্দির সিনিডস্ (cenidos) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। অন্য দলের নাম ডগ্‌মেটিষ্ট (Dogmatists) ইহাঁদের বিদ্যামন্দির কস্ (cos) নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

১। **এম্পিরিক্স**—ইহাঁরা চিকিৎসার জন্য রোগের কারণ নির্ণয় বা শরীর ব্যব-

চ্ছেদ বিদ্যা (Anatomy) শিক্ষা আবশ্যক মনে করিতেন না। চিকিৎসার জন্য পর্য্যবেক্ষণ (observation) প্রত্যক্ষ লব্ধজ্ঞান (experience) এবং পরীক্ষিত ঔষধ সকল প্রকৃতির রোগে ব্যবহার করা চিকিৎসার উপায় বলিয়া যাইতেন।

২। ডগ্‌মেটিষ্ট (Dogmatists)—ইহাঁরা চিকিৎসার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রোগের "হেতু", "পূর্ব্বরূপ" (remote and proximate cause) হাওয়া, জল ও দোষের গুণাগুণ, রোগী যে কার্য্য করিতেন তাহা, আদ্য ঋতুর ক্রিয়া প্রভৃতি শরীরের উপর কিরূপ কার্য্য করে, তাহার অনুসন্ধান করিতেন। রোগের চিকিৎসার জন্য এম্‌পিরিক্সদের ন্যায় সাধারণ নিয়মানুযায়ী চিকিৎসা করিতেন না। প্রত্যেক রোগীর রোগোৎপত্তির বিশেষ কারণগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া উপযুক্ত চিকিৎসা করিতেন। অবশ্য ইহাঁরা ইহা ব্যতীত এম্‌পিরিক্সদের ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ লব্ধজ্ঞান প্রভৃতির সহায়তা চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করিতেন।

আয়ুর্ব্বেদও ঠিক্ এই মতাবলম্বী ও এই ভাবে চিকিৎসা করেন। গ্রীক চিকিৎসা শাস্ত্রের তৃতীয় অবস্থায় সুবিখ্যাত হিপোক্রেটাসের অভ্যুদয় হয়। তিনি এ সময়ের গ্রীক্ চিকিৎসকগণের অগ্রণী ছিলেন। (the central figar of this stage). আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্র তাঁহাকে চিকিৎসার জন্মদাতা (Father of medicine) বলিয়া স্বীকার করেন। সুখের বিষয় পাশ্চাত্য শিক্ষিত চিকিৎসকগণ আমাদের চরক ও সুশ্রুতকে হিপোক্রেটিসের ন্যায় সর্ব্বোচ্চ আসন দিয়াছেন।

১। রোগোৎপত্তির কারণ—হিপোক্রেটাসের মতে রোগোৎপত্তির কারণ চারিটী "দোষ"—যাহাকে তিনি "ক্রেসিস্" (crasis) বলিয়াছেন এবং যাহাকে আরবগণ খিল্ট (khilt) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসকগণ "দোষ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই "দোষ"গুলির বিকৃত অবস্থা হওয়া রোগের কারণ বলিয়া সর্ব্ব পুরাতন চিকিৎসা শাস্ত্রগুলি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

এই দোষগুলি গ্রীক, রোমক ও আরব চিকিৎসকগণ চারিটী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা সোফ্‌রা (sofra—yellow bile) সউদা (souda—Black Bile) বল্‌গম্ (Balgam—phlym) খুন (Khun—Blered)। আয়ুর্ব্বেদ মতে দোষ তিনটী—"বায়ু পিত্ত কফ"।

২। দেহের "মূল" ধাতু—গ্রীক্, আরব ও হিন্দু চিকিৎসকগণ বলেন যে, কতকগুলি মূল ধাতুর (elements) সমষ্টিতে দেহোৎপন্ন হয়। হিপোক্রেটিসের মতে এই মূল ধাতু চারিটী—"ক্ষিত্যপ তেজো মরুৎ" হিন্দু চিকিৎসকগণের মতে এই মূল ধাতু পাঁচটী—"ক্ষিত্যপ তেজো মরুতদ্ব্যোম্"

৩। শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতা—হিপোক্রেটিসের মতে চারিটী দোষের সমতা ও চতুর্ভূতের বিশেষ সংযোগে (proper combination) শরীর সুস্থ থাকে। হিন্দু মতও তাই। তিনটী "দোষের" সমতা ও পঞ্চভূতের বিশেষ সংযোগে শরীর সুস্থ থাকে। কিন্তু হিন্দু চিকিৎসকগণ পঞ্চভূতের বিশেষ সংযোগে যে সপ্ত ধাতুময় শরীর বর্ণন করিয়াছেন, সেই সপ্ত ধাতু সাম্য অবস্থায় না থাকিলে শরীরের অসুস্থতা উৎপাদন করে। শরীরের অসুস্থতা সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে, কতকগুলি রোগ দোষের বিকৃত অবস্থার

জন্য উৎপন্ন হয়, আবার কতকগুলি দোষ ও ধাতুর বিকৃত অবস্থার জন্য উৎপন্ন হয়।

৪। রোগের ফলাফল নিরূপণ—রোগীর সাধারণ অবস্থা জানিয়া রোগের ফলাফল নিরূপণ (Prognosis) সম্বন্ধে হিপক্রেটাস অদ্বিতীয় ছিলেন। "In prognosis the Hippocratic school have perhaps never been excelled."—Eucyclepardia Britannica.

এবিষয়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ হিপক্রেটাস্ অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। চরকের সূত্রস্থানে সুখসাধ্য, কষ্টসাধ্য ও অসাধ্য রোগীর লক্ষণ যাহা বর্ণিত আছে এবং ইন্দ্রিয়স্থানে ইন্দ্রিয় সকলের পরীক্ষা সম্বন্ধে যাহা বর্ণিত আছে—তাহা হইতে রোগের ফলাফল সম্বন্ধে সম্যকভাবে নিরূপণ করা যায়।

৫। রোগের পরিচয় (Diagnosis)—এবিষয়ে হিপোক্রেটাসের জ্ঞান সামান্যই ছিল। এবিষয়ে আমাদের আয়ুর্ব্বেদ অদ্বিতীয় তাঁহারা হেতু, সামান্য ও বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ, রূপ, সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য বলাবল, কাল প্রভৃতি নির্ণয় করিয়া রোগের প্রকৃতির নিরূপণ করিতেন।

নাড়ী (Pulse) সম্বন্ধে হিপোক্রেটাস্ কিছুই জানিতেন না। এবিষয়ে পাশ্চাত্য গ্রীক ও রোমক চিকিৎসকগণের মধ্যে গ্যালেন (Galen) অদ্বিতীয় ছিলেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদে কনাদ কৃত নাড়ীবিজ্ঞান, গ্যালেনের নাড়ীবিজ্ঞান অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট।

প্রসাব (urine)-হিপোক্রেটাসের এ্যাফরিয়ম্ (aphoriam) নামক পুস্তকে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। আয়ুর্ব্বেদের প্রয়োগ-চিন্তামণি নামক গ্রন্থে আমরা এ সম্বন্ধে বিশেষরূপে অবগত হই।

প্রয়োগ-চিন্তামণি গ্রন্থে আমরা জিহ্বা পরীক্ষা, মুত্র পরীক্ষা, নাসা পরীক্ষা, নেত্র পরীক্ষা প্রভৃতির বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে দেখিতে পাই, ইহা হইতে আমরা আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতে রোগ নির্ণয় (diagnosis) করিয়া থাকি। হিপোক্রেটাসের রোগ নির্ণয় ও রোগের ফলাফল বিচার সম্বন্ধেও বিশেষ বর্ণনা আছে।

৬। চিকিৎসা (Treatment)—আয়ুর্ব্বেদের ন্যায় হিপোক্রেটাস ও ঔষধ অপেক্ষা পথ্যের বিশেষ উপকারিতা বলিয়া গিয়াছেন। "Great importance was given to diet medicines were regarded as secondary"—Eucyclopardia Britannica.

আয়ুর্ব্বেদ—এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধি পথ্যাদেব নিবর্ত্ততে।
নতু পথ্য বিহীনস্য ভেষজানাং শতৈরপি॥

আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রও ঐ মতের অনুমোদন করেন।

স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা শরীর ব্যাধি বিমুক্ত হয়—হিপোক্রেটাস বলিয়াছেন, রোগের কারণ দোষগুলি প্রথম অশুদ্ধ হইয়া রোগ উৎপন্ন করে; পরে সেগুলি স্বাভাবিক ক্রিয়া দ্বারা পরিপাক (digested) হইয়া দূরীভূত হয়। এই ভাবটী আমাদের আয়ুর্ব্বেদেও দেখিতে পাই। তরুণ জ্বরের সাম্যাবস্থায় লঙ্ঘনাদি ক্রিয়া দ্বারা রসের পরিপাক হইয়া নিরাম অবস্থায় পরিণত হয়। দূষিত রস শরীর হইতে দূরীভূত হওয়ার পর রোগী ব্যাধিমুক্ত হয়।

উপরিলিখিত বিষয়গুলি হইতে সম্যক অবগত হওয়া যায় যে, হিপোক্রেটাস্ লিখিত অনেকগুলি সত্যের সহিত আমাদের আয়ুর্ব্বেদের অনেক মিল আছে। এখন প্রশ্ন এই যে, হিপোক্রেটাস আয়ুর্ব্বেদকে এই সত্যগুলি দান করিয়াছেন বা আয়ুর্ব্বেদ হইতে হিপোক্রেটাস্ এই সত্যগুলি লইয়াছেন।

এসম্বন্ধে নিম্নে কতকগুলি মত দেওয়া গেল।

ডাক্তার পি, সি, রায় মহাশয় বলেন যে, হিপোক্রেটাস জন্মিবার পূর্ব্বেই হিন্দুরা "হিমারেল প্যাথলজির" উপর ভিত্তি করিয়া চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি বিধান করেন।

ডাক্তার এল্ডো, ক্যাষ্টালনি, বামার্গ সাহেবদের মতে হিপোক্রেটাস্ চিকিৎসা-সম্বন্ধে হিন্দু ও মিশর চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে অনেক বিষয় গ্রহণ করেন "Hoppocratus owes his medical inspirations to Egyptian and Indian medicine.

ডাক্তার ইলিয়ট সাহেব বলেন যে, হিপোক্রেটাসের সময় অস্ত্র চিকিৎসায় দ্বারা অর্ব্বুদ কর্ত্তন করা সাধারণ অস্ত্রচিকিৎসাভূত ছিল না, যদিও হিন্দুশল্য-চিকিৎসকগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই এই চিকিৎসাতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে হিপোক্রেটাস "চারিটী দোষের" কথা ও হিন্দুগণ ৩টী দোষের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতে বোধ হয় হিপোক্রেটাস্ হিন্দু চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে প্রথম তত্ত্ব অবগত হন। পরে নিজের বুদ্ধি অনুসারে আরও বিশদভাবে রোগোৎপত্তি বর্ণনা সম্বন্ধে চারিটী "দোষের" কথা বলিয়াছেন। যদিও হঠাৎ মনে হয়—হিপোক্রেটাসের ক্রেসিস্ (crasis) ও হিন্দুদের "দোষ" এক জিনিষ, অন্ততঃ আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দুইটীকেই Homour বলিয়াছেন—তথাপি ক্রেসিস্ ও দোষের" মধ্যে অনেক প্রভেদ।

শ্রীআশুতোষ রায়, এল্ এম্ এস্।

শাক সম্বন্ধে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মত।

শাক আমাদের দেশে বহুল পরিমাণে ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু শাকের সুখ্যাতি আদৌ নাই। যাবতীয় খাদ্যের মধ্যে শাক নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। কর্ম্ম-কর্ত্তা লোক-জন খাওয়াইয়া জোড় হাত করিয়া বলেন—গরীবের শাক অন্ন। নীতিশাস্ত্রকার বলেন,—স্বচ্ছন্দ বনজাত শাকান্ন আহারে যে উদর পূর্ণ হয় সে দগ্ধোদরের জন্য কে মহা পাপ করিবে? পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অঋণী এবং অপ্রবাসী হইয়া দিবসের তৃতীয় প্রহরে শাকান্ন আহার করাও সুখের। এইরূপ যেদিক দিয়াই দেখুন—শাক আমাদের দেশে জঘন্য খাদ্য বলিয়া পরিগণিত। গ্রাম্য কবির মুখ দিয়া শাকেরা স্বয়ং এ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছে। সকল শাকের আত্ম কাহিনী আমার মনে নাই। একটু নমুনা দেখুন,—

সজ্‌নের শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা।
আমায় মনে পড়্‌বে শুধু টানাটানির বেলা।

এদিকে ত শাকের এইরূপ নিন্দা, আয়ুর্ব্বেদও শাকের মাথায় একেবারে বজ্রাঘাত করিয়াছেন। আয়ুর্ব্বেদ বলেন ঃ—

শাকেষু সর্ব্বেষু বসন্তি রোগাস্তে হেতবো
দেহ বিনাশনায়।
তস্মান্ বুধঃ শাক বিবর্জ্জনন্তু কুর্য্যাৎ তথাম্লেষু
এব দোষঃ।

অনুবাদ ;—সকল প্রকারে শাকেই রোগ সকল বাস করিয়া থাকে এবং সেই সকল রোগ দেহ নাশের হেতু স্বরূপ। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তির শাকাহার পরিত্যাগ করা উচিত। অম্লেও এইরূপ দোষ আছে।

এদেশে শাকের এইরূপ অপমান, কিন্তু য়ুরোপে শাকের খুব আদর। য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ বলেন যে, নিত্য কিছু কিছু শাক-সবজী বিশেষতঃ সবুজ রঙ্গের শাক-সবজী খাওয়া উচিত। এদেশে শাকের এইরূপ অনাদর এবং য়ুরোপে শাকের আদরের কারণ কি ?

শাকের একটী গুণ এই যে, শাক আহার করিলে কোষ্ঠ শুদ্ধি হয়। "ঘৃতে বল বৃদ্ধি শাকে মল বৃদ্ধি" আমাদের দেশে প্রবাদ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্য দেশে যথেষ্ট মাংসের প্রচলন আছে। মাংসাহারে স্বভাবতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা জন্মে। শাক খাইলে মাংসের উক্ত দোষ নষ্ট হয় বলিয়া শাক মাংসাহারী দিগের পক্ষে আবশ্যক পদার্থ। আমাদের দেশে মাংসের ব্যবহার খুব কম এবং যেরূপ খাদ্য লোকে আহার করে, তাহাতে কোষ্ঠ বদ্ধতা হয় না। সুতরাং শাক এতদ্দেশীয় গণের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে।

কিন্তু শাক যতই নিন্দিত বা অপ্রয়োজনীয় হউক, আমরা নিত্য যথেষ্ট শাক আহার করিয়া থাকি এবং শাক নহিলে আমাদের চলেনা। ভোজের জন্য আজকাল লুচি-পোলাও ব্যবহৃত হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে অন্নই ব্যবহৃত হইত এবং অন্নের সহিত প্রথমে পত্র-শাক হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার শাকই নিমন্ত্রিতের রসনার তৃপ্তি সম্পাদন করিত। এখনও আমাদের দেশে চতুর্দ্দশীর চৌদ্দশাক বিশেষ আদরের সহিত গৃহস্থ মাত্রেই আহার করিয়া থাকে।

শাক বলিতে এখন আমরা কেবল পত্র-শাক এবং নাল শাকই বুঝিয়া থাকি, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে আমরা যেগুলিকে তরকারি বলি, সে সমস্তই শাক বলিয়া অভিহিত, পশ্চিমাঞ্চলেও তরকারী অর্থে শাক শব্দ হইয়া ব্যবহৃত থাকে।

শাক পাঁচ প্রকার। যথা পত্র-শাক, যেমন পালংশাক, নটে শাক, বেতো শাক প্রভৃতি, পুষ্প শাক, যেমন সজিনা ফুল, কুমড়া ফুল, সরিসার ফুল প্রভৃতি ; ফল-শাক, যেমন লাউ, কুমড়া, বেগুন প্রভৃতি, নালশাক, যেমন লাউডাঁটা, পুঁই ডাঁটা, কুমড়াডাঁটা, প্রভৃতি এবং কান্দ শাক, যেমন ওল, গাজর, মাণকচু, মূলা প্রভৃতি। শাস্ত্রে এই পাঁচ প্রকার উত্তরোত্তর গুরু অর্থাৎ পত্রশাক হইতে পুষ্পশাক, পুষ্পশাক অপেক্ষা ফলশাক, ফলশাক হইতে নাল শাক এবং নাল শাক অপেক্ষা কন্দশাক গুরুপাক বলিয়া কথিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদে এই পাঁচ প্রকার শাক ব্যতীত সংস্বেদজ শাক বলিয়া আর এক প্রকার কথিত হইয়াছে এবং ইহা সর্ব্বপেক্ষা গুরুপাক।

আয়ুর্ব্বেদে শাক মাত্রেই বিষ্টম্ভী অর্থাৎ পেট ভার করে, রুক্ষ, অতিশয় মল বর্দ্ধক এবং মল-মূত্র নিঃসরক বলিয়া কথিত হইয়াছে। পত্র-শাকের মধ্যে বেতো শাক এবং পল্‌তা নিন্দাবাদ হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে। যাঁহারা অপকারিতার ভয়ে শাক ব্যবহার করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহারা বেতোশাক এবং পল্‌তা যথেষ্ট আহার করিতে পারেন। পল্‌তা পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, পাচক, এবং জ্বর, কাস,ও ক্রিমিনাশক; বেতোশাক ত্রিদোষ অর্থাৎ বায়ু, পিত্ত ও কফনাশক, অগ্নি বর্দ্ধক, পাচক, লঘুপাক এবং প্লীহা, রক্ত পিত্ত, অর্শ ও ক্রিমিনাশক।

লাউ কচিই খাওয়া ভাল, পাকা লাউ অপথ্য কিন্তু কুমড়া কচি অপকারী, পাকা কুমড়াই সুপথ্য। পাকা কুমড়া বস্তি শোধক বলিয়া যাহাদের প্রস্রাবের দোষ, পাথরী প্রভৃতি রোগ আছে তাহাদের পক্ষে উপকারী। পাকা কুমড়া ত্রিদোষ নাশক, লঘু, অগ্নিদীপক এবং উন্মাদ, মূর্চ্ছা প্রভৃতি মানসিক রোগে হিতকর। এখানে কুমড়া অর্থে দেশী বা চালকুমড়া। বিলাতী বা মিষ্ট কুমড়ার উল্লেখ আয়ুর্ব্বেদে নাই।

পটোল একটী উৎকৃষ্ট তরকারি। ইহা ত্রিদোষ নাশক, লঘু, অগ্নিবর্দ্ধক, রুচিজনক এবং জ্বর, কাস, শ্বাস, ও ক্রিমিনাশক। কচি বেগুন অগ্নিদীপক, লঘু এবং সুপথ্য। পাকা বেগুন পিত্ত বর্দ্ধক ও গুরু। বেগুন-পোড়া খুব লঘুপাক। হংস ডিম্বের ন্যায় যে এক প্রকার শাদা বেগুন আছে তাহা অর্শ রোগে বিশেষ হিতকর।

ওল – অর্শঃ রোগে বিশেষ হিতকর, কিন্তু দ্রদ্রু, কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগে অহিতকর। ওল অগ্নিদীপক ও লঘু। কচি মূলাই সুপথ্য, বড় কাঁচা মূলা ত্রিদোষ বর্দ্ধক এবং গুরু। তবে সিদ্ধ করিয়া স্নেহ পদার্থ সহ সেবন করা যাইতে পারে। অন্য সমস্ত শাকই শুষ্ক হইলে অপকারী হয় কিন্তু শুষ্ক মূলা উপকারী।

উচ্ছে ও করলা—উচ্ছের সুপথ্য বলিয়া খ্যাতি আছে। উহারা পিত্তনাশক, বায়ুবর্দ্ধক নহে, লঘু, অগ্নিদীপক এবং জ্বর, কফ, পাণ্ডু রোগ ও ক্রিমি নাশক। ঝিঙ্গে পিত্ত নাশক কিন্তু কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। চিচিঙ্গে (হোপা) পটোল হইতে কিঞ্চিৎ হীন গুণ এবং শোষ রোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর।

নানা প্রকার শাকের নানা প্রকার গুণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা হইলনা। যে সকল শাক তিক্ত, সেগুলি প্রায়ই পিত্ত ও কফ নাশক। যে সকল শাক মধুর রস-বহুল—সেগুলি কফবর্দ্ধক এবং পিত্ত নাশক। তিক্ত ও কষায় রস বিশিষ্ট শাক সকল প্রায়ই বায়ুবর্দ্ধক।

কর্কশ, পুরাতন, পোকালাগা, শুষ্ক, অকালজাত অর্থাৎ যে সময়ে যে শাক সাধারণতঃ জন্মেনা—সেই সময়ে উৎপন্ন,—এরূপ শাক আহার করা উচিত নহে। শাক সিদ্ধ করিয়া এবং ঘৃত-তৈলাদি স্নেহ পদার্থ সংযুক্ত করিয়া আহার করা উচিত। কিন্তু কচি এবং যাহা সম্যক পুষ্ট হয় নাই—এরকম কন্দশাক ব্যবহার করা উচিত নহে।

এক্ষণে শাক সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত লিখিত হইতেছে। কন্দ-শাককে ইংরাজীতে

রুটস এবং টিউবরস (Roots and Tubers) এবং অন্যান্য শাককে গ্রীন ভেজিটেবলস, (Green vegetables) বলে।

কন্দশাক ব্যতীত অন্যান্য শাকে পুষ্টিকর পদার্থ খুব কম আছে এবং প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ জল আছে। সিদ্ধ করিলে জলীয়াংশ আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। জল ব্যতীত অল্প কার্ব্বোহাইড্রেট, অত্যল্প প্রোটিড়, চিনি চর্ব্বি, এবং সেলুলোজ ও ধাতব লবণ থাকে।

এইখানে প্রোটিড় প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া উচিত। কেননা সকল পাঠকের উহা জানা নাও থাকিতে পারে। পাশ্চাত্য মতে খাদ্যে পাঁচ প্রকার পদার্থ থাকে। যথা প্রোটিড়, কার্ব্বোহাড্রেট, চর্ব্বি, নানা প্রকার ধাতব লবণ এবং জল। মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি প্রোটীড্ বহুল খাদ্য এবং মনুষ্য শরীর প্রধানতঃ প্রোডিড্ জাতীয় খাদ্য দ্বারা নির্ম্মিত। কার্ব্বোহাইড্রেট তিন প্রকার, যথা—শ্বেতসার (struch), চিনি এবং সোলুলোজ। চাউল প্রভৃতির অধিকাংশই শ্বেতসার, এবং শ্বেতসারই পরিপাক প্রাপ্ত চিনির আকারে উদ্ভিদ দেহে সঞ্চারিত হয়। আর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের মধ্যে শ্বেতসার থাকে, সেলুলোজ সেই গুলিকে আবৃত এবং পরস্পর সংযুক্ত করিয়া রাখে। কচি সেলুলোজ হজম হয়, কিন্তু পাকা সেলুলোজ কাষ্ঠবৎ কঠিন বলিয়া হজম হয় না। আর ধাতব লবণ নানা প্রকার। আমরা সাধারণতঃ যে লবণ আহারকরি—তাহাও এক প্রকার ধাতব লবণ। এই সকল দ্রব্য শরীরে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিয়া থাকে।

শাকে যথেষ্ট পরিমাণে ধাতব লবণ—বিশেষতঃ পটাশ (Potash) ঘটিত লবণ আছে, সেইজন্য ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকর। শাকে প্রচুর সেলুলোজ থাকে বলিয়া উহার অল্প অংশই জীর্ণ হয়, অধিকাংশ মল রূপে নির্গত হইয়া যায়। কিন্তু যে অংশ জীর্ণ হয়না, তাহা অন্ত্রের কার্য্যকারী শক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। এইজন্য শাক খাইলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

যাঁহাদের পরিপাক শক্তি কম, তাঁহারা শাক সহজে জীর্ণ করিতে পারেনা। কাহারও কাহারও শাক খাইলে উদরে বায়ু সঞ্চয় হয়। শাক হজম হওয়া—নাহওয়া কিন্তু অনেকটা রন্ধনের উপর নির্ভর করে, সুসিদ্ধ হইলে শাক সহজে জীর্ণ হয়। পাকা শাকে সেলুলোজ অধিক থাকে এবং উহা কাষ্টবৎ কঠিন হইয়া পড়ে বলিয়া পাকা শাক হজম হয়না। শাক বাসি হইলে উহার স্বাদ নষ্ট হইয়া যায় এবং সহজে হজম হয় না। এই জন্য শাক টাট্‌কা খাওয়াই ভাল।

অন্যান্য শাক অপেক্ষা কন্দশাকের মধ্যে গোল আলুই শ্রেষ্ঠ এবং উহা সকল পরিবারেই নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। *

গোল আলুতে শতকরা ৭১·৭৭ ভাগ

* গোল আলু পূর্ব্বে এসিয়া বা য়ুরোপে ছিলনা। আনীত হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইহা সর্ব্ব গৃহস্থের চলেনা। সুতরাং আলুর আবিষ্কারে যে কিন্তু এই আলু আবিষ্কার করিয়া তজ্জন্য স্যার স্যার ওয়ালটার ব্যালে কর্ত্তৃক আমেরিকা হইতে দেশে যথেষ্ট প্রচলিত হইয়াছে। এখন আলু নহিলে যথেষ্ট উপকার হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায়। ওয়ালটার ব্যালেকে অনেক নির্য্যাতন সহ্য করিতে

জল, ১'৭৯ ভাগ প্রোটিড, ০'১৬ ভাগ চর্ব্বি, ২০'৫৬ ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট, ০'৭৫ ভাগ সেলুলোজ, এবং ০'৯৭ ভাগ লবণ আছে। প্রোটিড এবং চর্ব্বির ভাগ অত্যন্ত কম বলিয়া কেবল মাত্র আলু খাইলে মনুষ্যের দেহ রক্ষার উপায় হয় না। মৎস্য, মাংস, প্রভৃতি প্রোটিড বহুল খাদ্যের সহিত আলু আহার করিলে উহা উৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এদেশে চাউল যেমন প্রধান খাদ্য, আর্য্যাবর্ত্ত দেশে আলু সেইরূপ প্রধান খাদ্য। একজন পূর্ণবয়স্ক আইরিস প্রত্যহ ২।৩ সের আলু খাইয়া থাকে।

আলু সুসিদ্ধ হইলে বেশ সুস্বাদু এবং সহজ-পথ্য হইয়া থাকে। আলু সিদ্ধ করিয়া খাইতে হইলে খোসা শুদ্ধ সিদ্ধ করা উচিত। খোসা ছাড়াইয়া সিদ্ধ করিলে কতক লবণ বহির্গত হইয়া যায়, কিন্তু আমাদের দেশে ঝোল, দালনা, চড়চড়ি প্রভৃতির জল ফেলিয়া দেওয়া হয়না বলিয়া তরকারিতে আলুর খোলা ছাড়াইয়া দেওয়া ভাল।

যে আলু সিদ্ধ করিলে বেশ মাথা-মাথা বা বালি-বালি হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট এবং সহজ পাচ্য। কিন্তু যদি আলু কঠিন থাকে, তাহা হইলে মাথা-মাথা হয় না এবং তাহা সহজে জীর্ণ হয় না। যাহাদের পরিপাক শক্তি দুর্ব্বল তাহাদের ঐরূপ আলু খাওয়া উচিত নহে।

গোল আলু ব্যতীত রাঙ্গা আলু, মৌ আলু, চুবড়ি আলু ও শাঁক আলু আমাদের দেশে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাঙা আলু ও মৌ আলু এক জাতীয় এবং কাঁচা বা রাঁধিয়া খাওয়া যায়। রাঙ্গা আলু ও মৌ আলুতে যথেষ্ট ষ্টার্চ্চ ও চিনি আছে এবং ইহা বেশ পুষ্টিকর। চুপ্‌ড়ি আলুতেও যথেষ্ট ষ্টার্চ্চ আছে। উহা সিদ্ধ করিলে গোল আলুর ন্যায় সুস্বাদু হয় এবং উহা প্রায় তদ্রূপ গুণযুক্ত। শাঁক আলু কাঁচা খাওয়া যায়। ইহাতে যথেষ্ট জলও যথেষ্টও চিনি আছে।

বিটের কন্দে প্রায় ৮৭ ভাগ জল, ৯ ভাগ কার্ব্বোহাইড্রেট, প্রধানতঃ চিনি ১½, প্রোটিড, এবং একভাগ লবণ আছে। বিট পাকা এবং কঠিন না হইলে সহজে হজম হয়। শালগম, গাজর, মানকচু প্রভৃতিতে যথেষ্ট ষ্টার্চ্চ আছে, কিন্তু অন্যান্য দ্রব্য খুব কম। ইহাদের উপাদানের অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাকিলেও সাধারণতঃ ইহারা প্রায় এক প্রকার। কন্দে প্রোটিড ও চর্ব্বি কম বলিয়া মাংস, মৎস্য প্রভৃতি প্রোটিড ও চর্ব্বি বহুল খাদ্যের সহিত আহার করা উচিত।

পেঁয়াজ পুষ্টিকর কিন্তু গরম। পেঁয়াজে কিছু প্রোটেড এবং চিনি আছে। গন্ধক বহুল এক প্রকার তীক্ষ্ণ তৈল থাকায় পেঁয়াজে ঐরূপ গন্ধ অনুভূত হয়। কাঁচা পেঁয়াজ অপেক্ষা সিদ্ধ পেঁয়াজ লঘুপাক। রসুন—পেঁয়াজের ন্যায় গুণযুক্ত কিন্তু তীক্ষ্ণ।

কোঁড়ক বা ভূঁই কোঁড়ে যথেষ্ট প্রোটিড, কিছু চর্ব্বি ও চিনি এবং একপ্রকার অম্লরস আছে। কোঁড়ক যদি সহজে হজম হইত, তাহা হইলে উহা পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে

হইয়াছিল। মানুষ এমনই অকৃতজ্ঞ। এক্ষণে যাঁহারা আলু ভক্ষণ করেন, তাঁহাদের স্যার ওয়ালটার র‍্যালের আত্মার সদ্গতির জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

পরিগণিত হইতে পারিত। কিন্তু কোঁড়ক অত্যন্ত দুষ্পাচ্য এবং অনেকেরই উহা সহ্য হয়না। কোঁড়ককে ইংরাজিতে মশরুম (Mushroom) বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মাংস খাইলে কোষ্ঠ বদ্ধতা জন্মে বলিয়া শাক খাওয়া আবশ্যক। তাহা ব্যতীত শাক না খাইয়া, কেবল মাংস খাইলে, স্কার্ভি রোগ হয় বলিয়াও য়ুরোপীয়-দিগের পক্ষে শাক খাওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের দেশে শাকের এত অধিক ব্যবহার যে, শাক কমাইয়া দুগ্ধ, ডিম্ব, ঘৃত, মৎস্য প্রভৃতি বেশী খাওয়া উচিত। কিন্তু দেশের এমনই দুর্ভাগ্য, অন্য সুখাদ্য দূরে থাকুক—শাকও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতেছে।

তবে দুষ্প্রাপ্য হইলেও অনেক সময় লোকে প্রচুর মূল্য দিয়া শাক ক্রয় করিয়া থাকে। সেই পয়সায় অন্য শ্রেষ্ঠ সুখাদ্য অনায়াসে খাওয়া যাইতে পারে। খাদ্য-হিসাবে শাকের উপযোগিতা যে অতি কম, তাহা পাঠকগণ এই প্রবন্ধ হইতে বুঝিতে পারিবেন।

মহিলাগণের চিকিৎসা শিক্ষা।

(৩)

(অজীর্ণ ও অগ্নিমান্দ্য)

আমি আজ কা'র মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম জানি না,—স্নান করিয়া আসিয়া পিসীমার জন্য পূজার যায়গা করিতে বসিয়াছি—এমন সময় আমার স্বামী আসিয়া ডাকিলেন—"পিসীমা।"

পিসীমা তখন বাড়ীতে ছিলেননা, স্নান করিতে গিয়াছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া বলিলাম—"এত ভাবাইতে হয়? সাত আট দিন কোন খবরই নাই, আমরা ভাবনায় মরিয়া যাইতেছিলাম আর কি! যা' হো'ক এসেছ, বাঁচাইলে।"

স্বামী বলিলেন,—"রোজই আসিব-আসিব কথা হইতেছিল, সেইজন্য ৭।৮ দিন খবর পাও নাই।"

আমি বলিলাম,—"তা' যা' হোক, এখন ঘরে চল, কাপড়-চোপড় ছাড়, হাতে-মুখে জল দাও।"

স্বামী বলিলেন,—"পিসীমা কোথায়?" আমি বলিলাম,—"তিনি এখনি আসিবেন, স্নান করিতে গিয়াছেন।"

স্বামী বলিলেন,—"আমি একটু পরে আসিয়া বসিতেছি, তোমাদের খবর দিতে আসিলাম। আমার সঙ্গে আমাদের খাজাঞ্চি বাবু ও তাঁহার স্ত্রী আসিয়াছেন, খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রীর বড় ব্যারাম, তাঁহারা নৌকাতেই আছেন। আমি একখানা গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাদের লইয়া আসিতেছি। তাঁহারা আজ আমাদের বাড়ীতে থাকিবেন, তা'র পর কাল ক'লকাতায় যাইবেন। সেইখানে

ভাল ডাক্তারের দ্বারা খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রীর চিকিৎসা হইবে। আমিও বোধ হয় সঙ্গে যাইব।"

আমি বলিলাম—"তা' বেশ। তা'—তাঁ'রা কি জাতি? আমাদের রান্না খাইবেন তো'?

স্বামী বলিলেন,—"খাইবেন, তাঁ'রা আমাদেরই জাতি।" কথা শেষ করিয়া স্বামী চলিয়া গেলেন। আমি নিনির্মেষ-নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলাম।

অল্পক্ষণ পরে পিসীমা স্নান করিয়া আসিলেন। আমি বলিলাম—"পিসীমা, তাড়াতাড়ি পূজা সাঙ্গ করিয়া লও, আমাদের বাড়ীতে দুইজন কুটম্ব আসিতেছেন। শুধু তাই নয়, তোমাকে বোধ হয় আবার একটী রোগীরও চিকিৎসা করিতে হইবে।"

পিসীমা বলিলেন—"কি রকম?"

আমি সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলাম।

পিসীমা পূজা করিতে গেলেন। আমি বাহিরের ঘরটা একটু ঝাঁট-ঝোট্ দিয়া পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়া আসিলাম। স্বামী, খাজাঞ্চি বাবু ও তাঁহার পত্নীও অল্প কাল পরে আসিয়া পঁহুছিলেন। আমাদের বাড়ীতে একটা যেন মহা সহারোহ পড়িয়া গেল।

খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রী একে অভ্যাগত হইয়া আসিয়াছেন, তাহার উপর রোগী,—আমি ও পিসীমা তাঁহার যত্ন বিশেষ করিয়াই করিতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ আপ্যায়নে আমরাও বড় সন্তুষ্ট হইতে লাগিলাম। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সহিত আমার যেন সখীত্ব জন্মিয়া গেল।

আহারাদির পর, বিশ্রামের পর—বৈকালে বেলা তাঁহার ধরণী-চুম্বিত-নিবিড়কৃষ্ণ অলকারাশি বন্ধন করিয়া দিতে দিতে বলিলাম,—"আপনারা কালই যাইবেন? আমার ইচ্ছা, এখানে দিন কয়েক কাটাইয়া যান; কিন্তু সে কথা শুনিবেন কি?"

খাজাঞ্চী বাবুর স্ত্রী বলিলেন,—"শুনিব না কেন?—খুবই শুনিব। আপনাদের আদর-যত্ন দেখিয়া এস্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে দুঃখ হয়, কিন্তু শুনিয়াছেন তো, আমি রোগে ভুগিতেছি, আর তাহারই জন্য তো কলিকাতা যাইতেছি, সুতরাং ইচ্ছা থাকিলেও তো থাকিবার যো নাই।"

আমি বলিলাম, "আর যদি আপনার রোগ সারাইবার উপায় এইখানেই করা হয়। তা' হ'লে তো থাকিতে রাজি আছেন?"

তিনি বলিলেন—"তা' হ'লে আর রাজি হইব না কেন? কিন্তু এত বড় শক্ত রোগ—এখানে কে সারাইবে? সেখানকার বড় বড় ডাক্তারেরা তো হারি মানিয়াছে। সেই জন্যই তো কল'কাতায় যাওয়া, নইলে আর ছুটী লইয়া—পয়সা খরচ করিয়া লইয়া যাইবেন কেন?"

আমি বলিলাম—"আপনি যদি নির্ভর ক'রতে পারেন, তা' হ'লে বড়'বড় ডাক্তারেরা যা' আরাম ক'রতে পারেননি, তা' আমার পিসীমা-ডাক্তারে মন্ত্রের মত আরাম ক'রে দেবেন। পিসীমা আমার এমনতর অনেক রোগই আরাম ক'রেছেন। কিন্তু আপনি নির্ভর ক'রতে পারবেন কি?"

খাজাঞ্চী বাবুর পত্নী বলিলেন,—'সত্যঃ, উপকার দেখতে পেলে নির্ভর ক'রতে পা'রব না কেন; তা' যদি হয়, তা' হ'লে

তো আমাদের ক'লকাতা যাওয়ার জন্য অনেক টাকা খরচও বেঁচে যেতে পারে, আর উনিও দিন কতক আমাকে এখানেই রেখে চাকরি স্থানে গিয়ে আবার চাকরিতে লাগ্‌তে পারেন।"

আমি বলিলাম—"দেখুন, আপনারা যে নৌকায় আসিয়াছেন, তা' এখান থেকেই ছাড়িয়া দিন। আপনার স্বামীকে ব'লে এখানে এক সপ্তাহ থেকে যদি কোন ফল বুঝ্‌তে না পারেন, তা'র পর কল'কাতা যা'বেন। তখন এখান থেকেই নৌকা ক'রে গেলে চ'লবে, এখানেও তো নৌকা পাওয়া যায় না—এমন নয়।"

খাজাঞ্চী বাবুর পত্নী সে কথায় সম্মত হইলেন, তাঁহার স্বামীও এপ্রস্তাবে অসম্মত হইলেন না, পিসীমাও তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে রাজি হইলেন।

পিসীমা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বয়সটা কত হইয়াছে?" খাজাঞ্চী বাবুর গৃহিণী বলিলেন,—"সতের বৎসর।"

পিসীমা শুধাইলেন—"ছেলে পিলে হয় নি?"

খা-স্ত্রী।—না।

পিসী। অসুখের অবস্থাটা সব খুলে বল দিকিনি।

খা-স্ত্রী। এক বছর থেকে এ রকমটা হ'য়েছে। রোগটা কবিরাজেরা ব'লেছিল—অজীর্ণ। নানা রকম ব্যবস্থাও করা হ'য়েছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না।

পিসী। কি হয়?—যা' খাও—তা' জীর্ণ হয় না। দাস্ত কেমন হয়?

খা-স্ত্রী। রোগই তো ঐ। দাস্ত প্রায়ই ভাল হয় না, দশ পনের দিন পরে আবার বা একদিন খুব খানিক হড়্‌হড়্‌ ক'রে দশ পনের বার দাস্ত হ'য়ে প'ড়ল।

পিসী। অম্বল হয়? বুক জ্বলে কি?

খা-স্ত্রী। হ্যাঁ। বিকেল বেলা রোজই বুক জ্বলে। সকাল বেলা পেটটা ফেঁপে থাকে। খেলেও হয়,—না খেলেও হয়—সর্ব্বদাই যেন পেটটা ভ'রে আছে বোধ হয়।

পিসী। তুমি পরিশ্রম কি রকম কর? রান্না-বান্না—সংসারের কাজ-কর্ম্ম কি নিজেই কর,—না সংসারের অন্য লোকজন আছে!

খা-স্ত্রী। কাজ-কর্ম্ম আমি বড় ক'র্‌তে পারি না,—রান্নাবান্না আমাকে ক'র্‌তেও হয় না—অন্য লোকজন বাড়ীতে নাই কিন্তু ঝি ঠাকুর চাকর—সবই আছে,—সেই জন্য আমাকে কাজ কর্ম্ম বড় একটা ক'র্‌তে হয় না।

পিসী। ঐ তো হ'চ্ছে তোমার রোগের কারণ, ও সব যদি না থাক্‌তো, তা' হ'লে তোমার কোন রোগই হ'ত না। আমার চিকিৎসায় থা'ক্‌তে হ'লে তোমাকে খাট্‌তে হ'বে, চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌লে চ'ল্‌বে না।

খা-স্ত্রী। তা' খাট্‌তে আমি রাজি আছি, কিন্তু খাট্‌বার শক্তি তো থাকা চাই,—কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তে গেলে যে বড্ড কষ্ট বোধ হয়।

পিসীমা। অভ্যাস ওই রকম ক'রেছ—তাই কষ্ট হয়, আবার খাট্‌বার অভ্যাস ক'র্‌লে খাট্‌তে পা'র্‌বে।

খা-স্ত্রী। তা' ওষুধের ব্যবস্থাটা কি ক'র্‌বেন?

পিসী। ওষুধের ব্যবস্থা ব'লব বই কি! তা' ওষুধের ব্যবস্থা তো তোমায় শুধু ব'ল্‌লে হ'বেনা, আমার বউমায়েরই ওষুধের কথা

গুলি ভাল ক'রে শুন্‌তে হ'বে। বউমাই তো ব্যবস্থা শুনে ওষুধ তৈরি ক'রে দেবেন।

আমি বলিলাম—তুমি বল না পিসীমা, আমি তো সব শুন্‌ছি।

পিসীমা বলিলেন,—আমাদের বাগানের গাছের পাতি লেবুর গাছটার লেবুগুলো যে ফুরিয়ে গেল। কাল বাজার থেকে কতকগুলো পাতিলেবু আনা'তে হ'বে। আর খানিকটা বিট নুন আনা'তে হ'বে। কতকগুলো ডাবও চাই। সকাল-সন্ধ্যেয় দু'বার ক'রে দু'আনা ভ'র বিট নুনের গুঁড় মুখে ফেলে একটু জল খেতে হ'বে। সকালে ঐটে খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে—বড় হ'লে আধখানা—আর ছোট হ'লে একটা পাতি লেবুর রস এক ছটাক জলে গুলে সেই জলটা চুমুক দিয়ে খেতে হ'বে। দু'পর বেলা ভাত খাওয়ার একঘণ্টা পরে আধ পোয়া টাট্‌কা ঘোল ঐ রকম দু'আনা ভ'র বিট নুনের গুঁড় মিশিয়ে সেইটে খেয়ে ফে'ল্‌বে। বিকাল বেলা খানিকটা ডাবের জল—এ ছাড়া আমি আর কোন ওষুধের ব্যবস্থা ক'রব না,—এই আমার ওষুধ।

থা-স্ত্রী। সে কি!—এত বড় রোগ, এতেই সেরে যা'বে?

পিসী। এসব রোগ মা, ওষুধে সারে না, এ সব রোগ সারে নিয়মে। একটু বেছে-গুছে খাওয়া, পরিশ্রম করা—এই সবই হ'ল—এসব রোগের ওষুধ। লোকনাথ বদ্দি ব'লত—অজীর্ণ সারা'তে হ'লে পরিশ্রমের মত ওষুধ নেই, কোন ওষুধ না খেয়ে শুধু পরিশ্রম ক'র্‌লেও নাকি অজীর্ণ রোগ সেরে থাকে।

থা-স্ত্রী। তা' আমি আপনার ব্যবস্থা—তেই দিন কতক থা'কব, কিন্তু শুধু এতে সা'র্‌বে কিনা তাই ভাবছি।

পিসী। ওই ভাবনাইতো হ'য়েছে রোগ না সার্‌বার কারণ। মনটা যদি স্থির ক'র্‌তে পার এবং আমার কথাগুলি যদি সব পালন কর—তা' হ'লে তুমি যে এখান থেকেই সার্‌তে পা'রবে, তা' আমি খুব জোর ক'রে ব'ল্‌তে পারি। তবে আরও কতকগুলি নিয়ম পালন ক'র্‌তে হ'বে। দিনের বেলায় ঘুমাও কি?

থা-স্ত্রী। একটু ঘুমাই বই কি, খাওয়ার পর দু'তিন ঘণ্টা ঘুমান অভ্যাস আছে।

পিসী। তা'তে আর অজীর্ণ হ'বে না। লোকনাথ বদ্দি ব'লত—

দিবা নিদ্রা আয়ু হরে।
এ কাজ যেন কেউ না করে॥

লোকনাথ বদ্দি আরও ব'লত—যতগুলি কারণে অজীর্ণ রোগের উৎপত্তি হয়, তা'র মধ্যে দিনে ঘুমানো একটি প্রধান কারণ। দিনে ঘুমানো, রাত্রি জাগরণ, অধিক জলপান, অল্প খাওয়া, বেশী খাওয়া বা অসময়ে খাওয়া, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ করা—এই সব কারণে অজীর্ণ রোগ উপস্থিত হয়। তা' এখনকার দিনে হেলায়-শ্রদ্ধায় এর অনেকগুলি কারণই অনেকে ক'রে থাকে। বাঙ্গালা দেশে অজীর্ণ রোগেও সেইজন্য লোকে বেশী ভোগে শুন্‌তে পাওয়া যায়।

আমি বলিলাম,—কি রকম নিয়মে থাক্‌লে অজীর্ণ রোগ হয় না পিসীমা?

পিসীমা বলিলেন,—লোকনাথ বদ্দি অজীর্ণ রোগ জন্মাবার যে কারণগুলি ব'লত—ব'ললাম, সেগুলি না ক'র্‌লেই অজীর্ণ রোগ জন্মা'বার কোন ভয় থাকে না। সে-

কালে মেয়েমানুষদের রোগের কথা কে কবে আবার জান্‌তে পা'র্‌তো। সেকালের মেয়েমানুষেরা—যত বড় ঘরের মেয়েই হোন,—ছড়া-ঝাঁট দেওয়া, ঘর-দুয়ার পরিষ্কার করা রান্না বান্না করা—এই সব নিয়েই থাক্‌ত। গৃহস্থ-সংসারের মেয়েরা সকাল বেলা এক পেট ক'রে পান্ত ভাত খেয়ে নিয়ে তা'রপর কাজ কর্ম্ম ক'রত। পরিশ্রমের গুণে সে পান্ত ভাত দণ্ড দু' তিনের মধ্যে কোথায় যে হজম হ'য়ে যে'ত তার ঠিক থা'কত না। শ্বশুর-শাশুড়ী, স্বামী-দেওর, ছেলে-মেয়ে সকলকে খাইয়ে বেলা আড়াই প'র—তিন প'রের সময় আবার তা'রা বেশ ক'রে আহার ক'রত। এখন সেরূপ কাউকে করাও দেখি? অমনি বুক জ্ব'লবে—অমনি ঢেকুর উঠ্‌বে—অমনি অম্বল হ'বে। এখন পান্ত ভাতের স্থানে হ'য়েছে চা। পুরুষেরা ও চা খান, দেখাদেখি মেয়েরাও তা' খেতে শিখেছেন। অনেকের আবার এক বেলা কি দুই বেলা খেয়েও তৃপ্তিলাভ হয় না, দিনের মধ্যে পাঁচ সাতবার এই চা'ই খাচ্ছেন। এত চা খেয়ে ক্ষিদে থা'কবে কোত্থেকে! অজীর্ণ হ'বেনা কেন? এই রকম ক'রেই তো আমোদের দেশ নষ্ট হ'তে ব'সেছে।

আমি বলিলাম—পিসীমা, তুমি এতও জান!

পিসীমা বলিলেন,—না জান্‌লে আর তোমাকে মনের মত ক'র্‌তে পেরেছি। আমাদের পাড়ার সবাই পান্ত ভাত খাওয়া বন্ধ ক'রেছে, কিন্তু আমি তোমাকে সেই সাবেক চালে রেখেছি, সেইজন্যই ব'লতে নেই,—তোমার শরীরটে এত খাটুনিতেও এখনো ভেঙ্গে প'ড়েনি।

খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রী সকল শুনিয়া বলিলেন, "আমি আপনার উপদেশ শুনিয়া নিয়ম পালন কর্‌ব। আহারের ব্যবস্থাটা আমার কি হবে?"

পিসী।—দু'বেলাই ভাত, মাছের ঝোল, পটল-বেগুন-ঝিঙে-উচ্ছে-করলা-ডুমুর-মান কচু-ওল-পেঁপে—এই সমস্তর তরকারি। ডালের মধ্যে শুধু মুগের ডাল। জল খাবার অন্য কিছু খেতে দেবনা—খুব ভাল সন্দেশ হ'লে দু'একটা দিতে পারি, তা'ছাড়া মুড়ি-নারকেল—আদা-নুন। দিনের বেলা ঘুমা'তে পা'বে না, রাত্রিও জা'গতে পা'বে না। দিনের বেলা দুই প্রহরের মধ্যে এবং রাত্রিতে এক প্রহরের মধ্যে আহার ক'রতে হ'বে। আর সকাল থেকে আমার বউমার সঙ্গে সংসারের কাজ কর্ম্ম ক'র্‌তে হ'বে।

খাজাঞ্চি বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আমি আপনার উপদেশ বর্ণে বর্ণে পালন ক'রব।"

তাহার পর দিন হইতে তাঁহার চিকিৎসার সকল ব্যবস্থার ভার আমার উপর পড়িল। আমি পিসীমার ব্যবস্থানুসারে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। ফলে এক সপ্তাহেই তিনি এরূপ উপকার বোধ করিলেন যে, তখন আর তাঁহার জন্য আমাকে আর বেশী ব্যস্ত হইতে হইল না, তিনি নিজেই নিজের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

এইরূপ ভাবে যখন একমাস কাটিয়া গেল—তখন আর তাঁহার রোগের চিহ্ন মাত্র থাকিল না। এই সময় তাঁহার স্বামী বাড়ী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। পিসীমার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করা হইল। পিসীমা অনুমতি প্রদান করিলেন, কিন্তু